ভূস্বর্গ ভয়ংকর

সুমাইয়া রায়

ফেলুদা

ভূস্বর্গ ভয়ংকর

সত্যজিৎ রায়

প্রথম প্রকাশিত হয়:

শারদীয় দেশ, ১৯৮৭

১

এবার কোথায় যাওয়া হচ্ছে? এক মুঠো চানাচুর মুখে পুরে চায়ে একটা চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু—যা গনগনে গরম পড়েছে, আর তো এখানে থাকা যায় না।

কোথায় যাওয়া যায়, সেটা আপনিই বলুন না, বলল ফেলুদা। ভ্রমণের নেশা তো আপনার আরও প্রবল। আমি তো ইচ্ছা করলে বারো মাস কলকাতায় পড়ে থাকতে পারি।

আপনার হাতে এখন কোনও কেস নেই তো?

তা নেই।

কোথায় যেতে চাইছে আপনার মন?

পাহাড় তো বটেই; আর পাহাড় বলতে আমি হিমালয়ই বুঝি। বিন্ধ্য, ওয়েস্টার্ন ঘাট্‌স-এ সব আমার কাছে পাহাড়ই নয়। আমার মন যেখানে যেতে চাইছে সেখানে না গেলে নাকি জন্মই বৃথা।

কোথায়?

এত হিন্টস দিলুম তাও বুঝতে পারলেন না?

ভূস্বর্গ?

এগজ্যাক্টলি! কাশ্মীর! প্যারাডাইজ অন আর্থ। রোজগার তো বলতে নেই, দুজনেরই অনেক হল। সংসার আপনারও নেই, আমারও নেই। এত টাকা জমিয়ে রাখছি। কার জন্যে? চলুন বেরিয়ে পড়ি—ক্যালকাটা টুঁ ডেলহি, ডেলহিটু শ্রীনগর।

শ্রীনগরই তো কাশ্মীরের একমাত্র দেখার জায়গা নয়। আরও আছে।

সবই দেখা যাবে একে একে।

পাহালগাম, গুলমার্গ, খিলেনমার্গ-অনেক কিছু দেখার আছে।

তা বেশ তো; দিন পনেরো হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। একটু ঘোরাঘুরি না করলে আমার মাথায় প্লট আসে না। পুজোর জন্য একটা কিছু লিখতে হবে তো!

আপনার অত অনেস্টির প্রয়োজন কী জানি না। আর পাঁচ জন যারা লিখছে, সব বিদেশি থ্রিলার থেকে প্লট সংগ্রহ করছে। ভদ্র ভাষায় বললাম, আসলে স্রেফ চুরি ছাড়া আর কিছুই না। আপনিও এবার লেগে পড়ুন।

হ্যাঁ, আমি চুরি করি আর শেষটায় আপনিই গালমন্দ করুন। আপনার কথার শ্লেষ ভুজালির চেয়েও তীক্ষ্ণ।

তা হলে যেভাবে চলছে চলুক—থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়।

তা না হয় হল, কিন্তু কাশ্মীর যাবার ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়াচ্ছে?

উসবোটে থাকবেন তো?

শ্রীনগরে?

শ্রীনগর ছাড়া আর হাউসবোট নেই। ডাল লেকের উপরে থাকা যাবে।

সেই তো ভাল—তাই নয় কি? বেশ একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে।

অনেক খরচ কিন্তু। তার চেয়ে বোধহয় হোটেল সস্তা।

ও সব খরচের কথা শুনতে চাই না। ব্যাঙ্কে অনেক জমে আছে—ইনকাম ট্যাক্স দিয়েও। যাব—গিয়ে ম্যাক্সিমাম ফুর্তি যাতে হয়, তাই করব।

তা হলে শ্রীনগরে হাউসবোট, পাহালগামে তাঁবু আর গুলমার্গে লগ ক্যাবিন।

চমৎকার! টুরিস্ট অফিস থেকে লিটারেচর নিয়ে আসব, তারপর দিন ক্ষণ দেখে বেরিয়ে পড়া যাবে।

*

কাশ্মীরের প্রস্তাবটা ফেলুদারও মনে ধরেছিল, সেটা আমি বুঝেছিলাম। লালমোহনবাবু ঘণ্টা দু-এক আড্ডা মেরে চলে যাবার পর ফেলুদা টুরিস্ট অফিসে

গিয়ে কাশ্মীর সম্বন্ধে পুস্তিকা ইত্যাদি নিয়ে চলে এল। বলল, মনস্থির যখন করেই ফেলা হয়েছে, তখন আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আজ সোমবার; শনিবার নাগাত বেরিয়ে পড়া যাবে।

ঠাণ্ডা হবে না। ওখানে?

তা হবে, এবং তার জন্যে তৈরি হয়ে যেতে হবে। লালমোহনবাবু সেটা জানেন তো?

নিশ্চয়ই জানেন। তবে সাবধানের মার নেই। কাজেই ওঁকে সেটা ফোনে জানিয়ে রাখা দরকার। এমনিতেই তো শীতকাতুরে।

দু দিনের মধ্যে লক্তি থেকে আমাদের শীতের কাপড় এসে গেল। ঠিক হল প্রথমে শ্রীনগরেই দিন সাতেক থাকা হবে, তারপর অন্য জায়গাগুলো দেখা যাবে। হাউসবোট কাশ্মীর টুরিজম থেকে ব্যবস্থা করা হল। একটা হাউসবাটে একটা পুরো ফ্যামিলি থাকতে পারে। তাই তিনজনের পক্ষে যথেষ্ট। আমি না গিয়ে পড়া পর্যন্ত কল্পনাই করতে পারছিলাম না ব্যাপারটা কী রকম হয়। নৌকোয় থাকা! তাও আবার লাক্সারি নৌকো! বোধহয় জমিদারি আমলের বজরার মতো। পুস্তিকায় ছবি দেখে বুঝলাম যে হাউসবোটগুলো কটেজের মতো দেখতে। সেই সঙ্গে আবার ছোট ছোট নৌকোর ছবিও দেখা যাচ্ছে, যাতে করে ডাল লেকে ঘুরে বেড়ানো যায়; কারণ হাউসবোটগুলো নড়েচড়ে বেড়ায় না।

ফেলুদাকে বললাম, যা বুঝছি, শ্রীনগর শহরটায় দেখবার জিনিসের মধ্যে আছে কিছু বিখ্যাত মোগল বাগান। তবে পাহাড়েঘেরা উপত্যক, সব কিছুর মধ্যে দিয়ে ঝিলাম বয়ে চলেছে, তা ছাড়া দু-তিনটে লেক, পপলার, ইউক্যালিপটাস, চিনার গাছের সারি-মনে হয় জায়গাটা খুব সুন্দর। তবে গুলমার্গ পাহালগামও কিছু কম যায় না। পরে যদি ১১,০০০ ফুট খিলেনমার্গে ওঠা যায়, তা হলে সেখান থেকে নাঙ্গা পর্বতের নাকি একটা অদ্ভুত ভিউ পাওয়া যায়। পনেরো দিনের জন্য খুব জমজমাট টুর, কাজেই চিন্তা করার কিছুই নেই।

প্ল্যানমাফিক আমরা শনিবারই বেরিয়ে পড়লাম। এবার প্লেনে তিনজনের এক লাইনে সিটি পড়েনি বলে। লালমোহনবাবুকে আলাদা বসতে হল। ভদ্রলোক দেখলাম তাঁর পাশের একটি বাঙালির সঙ্গে খুব আলাপ জুড়ে দিয়েছেন। দিল্লিতে এয়ারপোর্টে এসে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সহযাত্রীটি কে ছিলেন মশাই?

লালমোহনবাবু বললেন, নাম সুশান্ত সোম, এক রিটায়ার্ড জজের সেক্রেটারি। দলেবলে কাশ্মীর চলেছেন। ওঁরাও হাউসবোটে থাকবেন। ভদ্রলোক তোমার দাদাকে দেখেই চিনেছেন! আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কোনও তদন্তে যাচ্ছি কি না। একবার মনে হুল বলি হ্যাঁ, তারপর মাইন্ড চেঞ্জ করে সত্যি কথাটাই বলে দিলুম।

চারিদিকে বাঙালির ভিড়, তাদের অনেকের কথাবার্তা শুনেই মনে হল তাঁরাও কাশ্মীর যাচ্ছেন। শ্রীনগরের প্লেন ছাড়তে আরও তিন ঘণ্টা দেরি। তার মধ্যে আমরা আর এক প্রস্ত চা খেয়ে নিলাম। রেস্টোর‍্যান্টে লালমোহনবাবুর আলাপী ভদ্রলোকের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। উনি আমাদের টেবিলের দিকে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন।

আমার নাম সুশান্ত সোম, ভদ্রলোক ফেলুদাকে নমস্কার করে বললেন— আপনার বন্ধু মিঃ গাঙ্গুলীর সঙ্গে আলাপ হল, তাই ভাবলাম সুযোগ যখন মিলেছে তখন আপনার সঙ্গেও আলাপটা সেরে নিই। আমি আপনার একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত। আপনার তদন্তের কথা অনেক পড়েছি। দাঁড়ান, আমার বাসও হয়তো আপনাকে দেখলে খুশি হবেন।

রেস্টোর‍্যান্টের দরজা দিয়ে আরও দল ঢুকেছে। সুশান্তবাবু তাদের দিকেই এগিয়ে গেলেন। জনা চারেক ভদ্রলোক, তার মধ্যে একজন বেশ বয়স্ক, প্রায় বৃদ্ধ বললেই চলে। সুশান্তবাবু তাঁকে ফিসফিস করে কী বলতে ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। ফেলুদা উঠে দাঁড়াল।

বসুন বসুন–উঠছেন কেন? বললেন ভদ্রলোক। আমার নাম সিদ্ধেশ্বর মল্লিক। আমি প্রায় সারা জীবন ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু এই প্রথম একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভকে দেখলাম।

ফেলুদা বলল, ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত মানে—?

আমি একজন রিটায়ার্ড জজ। বহু অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছি। এখন সে কাজ থেকে অবসর নিয়ে বিশ্রাম করছি। শরীরও কিঞ্চিৎ ভেঙে পড়েছে—সঙ্গে ডাক্তার নিয়ে ঘুরতে হয়। ছেলেও আছে, বেয়ারাও আছে। আর আছে প্রাইভেট সেক্রেটারি। এই ইনি। সুশান্ত খুব কাজের ছেলে। একে ছাড়া চলে না। আমার।

আপনারা শ্রীনগরেই থাকবেন? জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

আপাতত। তবে ইচ্ছে আছে কাশ্মীরটা একটু ঘুরে দেখার।

আমাদেরও ওই একই প্ল্যান, বলল ফেলুদা। শ্রীনগরে নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে। আপনারা কি হাউসবোটে থাকবেন?

হ্যাঁ। হাউসবেটটা একটা ইউনিক ধ্যাপার। আমি সিকুটি-ফোরে। একবার এসে থেকে গেছি। ইয়ে, এনার সঙ্গে তো আলাপ হল না–ভদ্রলোক লালমোহনবাবুর দিকে ফিয়েছেন।

আমিও ক্রাইম, বলল জটায়ু। আমি একজন রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক।

ওরে বাবা! তা হলে তো ক্রিমিন্যাল ছাড়া সবাই উপস্থিত দেখছি...ঠিক আছে। দেখা হবে শ্রীনগরে। আমরাও একটু চায়ের ব্যবস্থা দেখি গিয়ে।

২

আকাশ থেকে শ্রীনগর উপত্যকার এক রূপ, আর মাটিতে নেমে আর এক রূপ। চোখ জুড়িয়ে যায় তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর এও ঠিক যে এ

জায়গার সঙ্গে দার্জিলিং-সিমলার কোনও মিল নেই। শ্রীনগরের দৃশ্য একেবারে অনন্য। সেটা আরও বেশি করে বুঝতে পারলাম ট্র্যাক্সিতে করে শহরে আসার সময়। শহর থেকে এয়ারপোর্ট সাত মাইল। একবার মনে হয়েছিল উপত্যক বলে বুঝি অনেকটা কাঠমাণ্ডুর মতো হবে, কিন্তু তারপর লেক আর ঝিলাম নদী দেখে সে ধারণা একদম পালটে গেল।

আমাদের যেতে হবে ডাল লেকের দক্ষিণে শহরের রাস্তা বুলেভার্ডে। আধা ঘণ্টায় বুলেভার্ডে পৌঁছে গেলাম। লেকের এদিকটা পাকা গাঁথুনি দিয়ে ঘেরা। ঘাট থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছোট নৌকোয় গিয়ে উঠতে হয়। এই নৌকোকে এখানে বলে শিকার। ভেনিসে যেমন জলপথে যাতায়াতের জন্য গণ্ডোলা, এখানে তেমনি শিকারা। আমাদের হাউসবোটের নাম ওয়াটার লিলি।ওয়াটার লিলির শিকারাও ঘাটেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমরা মালসমেত তাতে গিয়ে উঠলাম। তারপর পঞ্চাশ হাত খানেক গেলেই পাশাপাশি সার বাঁধা হাউসবোট। এই সারি কিছুদূর যাবার পর লেক চওড়া হয়ে গেছে তারপর আর হাউসবোট নেই। যা আছে সবই লেকের পশ্চিম অংশে।

শিকারা থেকে বোটে উঠতে কোনও কসরতের দরকার হয় না, খুবই সহজ ব্যবস্থা। বোটের সামনের দিকে খানিকটা খোলা জায়গা, সেখানে ইচ্ছা করলে বসা যায়; আবার সিঁড়ি দিয়ে উপরের ডেকে ওঠার বন্দোবস্ত আছে, সেখানে চেয়ারে বসে চারিদিকের দৃশ্য উপভোগ করা যায়, চা খাওয়া যায়, আর স্রেফ আড্ডাও মারা যায়।

ভিতরে ঢুকলে প্রথমেই বসবার ঘর, তাতে সোফা, চেয়ার, কার্পেট, ইত্যাদি বৈঠকখানার যাবতীয় সরঞ্জাম রয়েছে, দেয়ালে ছবি রয়েছে, ফুলদানিতে ফুল রয়েছে, আবার একটা ছোট লাইব্রেরিও রয়েছে। বসবার ঘরের পরে খাবার ঘর, দুটো বেডরুম, বাথরুম ইত্যাদি। সব মিলিয়ে জলের উপর একটি বাংলো

বাড়ি যাতে সব রকম ব্যবস্থা আছে। কিচেনও আছে, তবে সেটা পিছন দিকে একটা ছোট্ট আলাদা নৌকোয়।

লালমোহনবাবুর মুখে হাসি লেগেই আছে, বললেন, ভাগ্যিস ডিসিশনটা নিয়েছিলাম। এর ক্রেডিট কিন্তু সবটাই আমার পাওনা। তোমার দাদা ভূস্বর্গের কথা ভাবেননি।

ফেলুদা বলল, আমি তো আপনার মতো লেখক নই। আইডিয়া আসা উচিত। আপনার মাথা থেকে। যাকগে, এখন আগে একটু চা খেয়ে শিকারায় করে লেকটা একবার ঘুরে দেখা যাক।

দুজন চাকর রয়েছে হাউজবোটের সঙ্গে, নাম মাহমুদিয়া আর আবদুল্লা।

চা খেয়ে বেরোতে সূর্য হেলে এল পশ্চিমে। মে মাস হলে কী হবে, বেশ ঠাণ্ডা; আমাদের কলকাতায় শীতের সময় যে পোশাক পরতে হয়, এখন এখানেও তাই পরতে হয়। ফেলুদা বলল, আজ শুধু লেকটা ঘুরে দেখা যাবে, কাল থেকে সাইট সিইং আরম্ভ হবে। বুলেভার্ডের পিছনেই দেখতে পাচ্ছেন পাহাড় রয়েছে, এক হাজার ফুট উঁচু। ওর মাথায় রয়েছে শঙ্করাচার্যের মন্দির। সম্রাট অশোকের ছেলে জালুকের তৈরি। তা ছাড়া লেকের পুব দিকে মোগল বাগান রয়েছে– নিশাদবাগ, শালিমার, চশমা শাঁহি-এগুলোও দেখা চাই। চশমা শাহির স্ক্রিপ্রং-এর জল নাকি একেবারে অমৃত-যেমনই স্বাদ, তেমনি ক্ষুধাবর্ধক।

লেকের মাঝখানে একটা ছোট্ট দ্বীপ দেখা যাচ্ছে, ওটা কী? আমি জিজ্ঞেস করলাম। আমি জানতাম ফেলুদা কাশ্মীর সম্বন্ধে সব পড়াশুনা করে এসেছে।

ফেলুদা বলল, ওটাকে বলে চার মিনার। দ্বীপটার চার কোণে চারটি চিনার গাছ রয়েছে।

মাহমুদিয়া আর আবদুল্লা শিকারা চালাতে আরম্ভ করল, আমরা বাঁয়ে গোটা দশেক হাউসবোট পেরিয়ে আসল লেকে গিয়ে পড়লাম! দুটো পাশাপাশি হাউসবোট নিয়ে রয়েছেন রিটায়ার্ড জজ সিদ্ধেশ্বর মল্লিক। আর তাঁর সঙ্গোপাঙ্গ;

আমরা খোলা লেকে পড়বার আগে একটা বোট থেকে সুশান্ত সোম আমাদের দিকে হাত নেড়ে বললেন, ফেরার পথে একবার ঢুঁ মেরে যাবেন। চায়ের নেমন্তন্ন রইল।

ডাল লেকের সৌন্দর্যের বর্ণনা দেবার ভাষা আমার জানা নেই। স্বচ্ছ কাচের মতো জল, হাওয়া নেই বলে ঢেউ নেই, তাই আয়নার মতো চারিদিকের পাহাড়গুলো প্রতিফলিত হচ্ছে। এখানে-ওখানে পদ্ম শালুক শাপলা ফুটে আছে, শিকার সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে চলেছে। লালমোহনবাবুকে কবিতায় পেয়েছে, বললেন, কাশ্মীর সম্পর্কে আমাদের এথিনিয়াম ইস্কুলের মাস্টার বৈকুণ্ঠ মল্লিকের একটা আট লাইনের কবিতা আছে। ভদ্রলোক বহু জায়গায় ঘুরেছিলেন, আর সেই সব জায়গা নিয়ে পদ্য লিখে গেছেন। কাশ্মীরেরটা শুনুন ফেলুবাবু, কী রকম ডিসেন্ট–

করি নত শির
তোমারে প্রণমি কাশ্মীর
কুমারীকার অপর প্রান্তে
অবস্থান তব ভারতের উত্তর সীমান্তে
রাজধানী শ্রীনগর
ঝিলামের জলে ধায় অপূর্ব শহর
কত হ্রদ, কত বাগ, কত বাগিচা
অন্য নগরের সাথে তুলনা করিতে যাওয়া মিছা।...

বাঃ, দিব্যি, বলল ফেলুদা—যদিও বুঝলাম সেটা জটায়ুর মনে কষ্ট না দেবার জন্য। কবিতায় লালমোহনবাবুর রুচিটা যে একটু গোলমেলে তার পরিচয় এর আগেও অনেকবার পেয়েছি।

শুধু কবিতা নয়, ডাল লেকের দৃশ্যে ভদ্রলোককে গানেও পেয়েছে। গুনগুন করে কী গাইছেন জিজ্ঞেস করাতে বললেন উর্দু গজল।

এদিকে সন্ধ্যার আলো অনেক বেশিক্ষণ থাকে-অন্তত বছরের এই সময়টায়। আমরা সাড়ে সাতটায় যখন ফিরছি তখনও পুরো অন্ধকার হয়নি।

সুশান্ত সোম তাঁদের হাউসবাটের সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন, আমাদের দেখে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

আসুন, একটু আড্ডা মারা যাক।

আমরা এদের বোটের সামনে শিকারা দাঁড় করিয়ে ওপরে উঠলাম। এঁদের বোটের নাম রোজমেরি। এঁদের পাশেই রয়েছে। এদের অন্য বোট, সেটার নাম মিরান্ডা।রোজমেরি-তে থাকেন সুশান্ত সোম আর জজ সাহেবের ছেলে, নাম বিজয় মল্লিক। মিরান্ড-তে আছেন মিঃ মল্লিক, তার ডাক্তার হরিনাথ মজুমদার আর বেয়ারা প্রয়াগ।

চায়ের অর্ডার দিয়ে উপরের ডেকে উঠে সুশান্ত ফেলুদাকে বললেন, আপনার তাস চলে? তিন-তাস?

অভ্যোস নেই, বলল ফেলুদা, তবে তাসের প্রায় সব খেলাই মোটামুটি জানা আছে। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

নীচের বৈঠকখানায় তাসের আড্ডা জমেছে।

এত লোক পেলেন কোথায়?

প্লেনে দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে বিজয়ের। একজন বাঙালি, নাম সরকার; আর একজন পাঞ্জাবি। তিন জনেই জুয়াড়ি।

আমরা চারজনে বসলাম! সত্যি, কলকাতা যে কোন সুদূরে চলে গেছে তার কোনও হিসাবই নেই। হাউসবোটের টপ ডেকে বসে চা খাওয়ার আয়োজন-এ এক অভাবনীয় ব্যাপার। আমাদের ডান দিকের হাউসবোটে সাহেবরা এসে উঠেছে–সেখান থেকে বিলিতি বাজনার শব্দ আসছে। জানাল দিয়ে দেখা যাচ্ছে সাহেব-মোম সেই বাজনার সঙ্গে নাচছে সামনের বৈঠকখানায়।

ফেলুদা সুশান্তবাবুকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করল, সিদ্ধেশ্বরবাবু কদিন হল রিটায়ার করেছেন?

পাঁচ বছর, বললেন সুশান্তবাবু। ওঁর তখন ষাট বছর বয়স।

কিন্তু জজের তো রিটায়ার করার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।

ওর শরীরটা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অ্যানজাইনা। ভদ্রলোকের রিটায়ার করার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ডাক্তারের কথায় বাধ্য হয়ে করতে হয়। উনি বহু অপরাধীর প্রাণদণ্ড দিয়েছেন। এক-এক সময় বলেন, আমার শেষ জীবনে দুঃখ আছে। এত লোককে ফাঁসিতে পাঠালে তার একটা প্রতিক্রিয়া হবেই। উনি ডায়েরি লিখতেন; সে ডায়েরি সব এখন আমার হাতে কারণ আমি ওঁর একটা জীবনী লিখছি।–যদিও সেটা আত্মজীবনী হিসেবেই বেরোবে। সেই ড্রায়েরিতে উনি যেদিনই কারুর প্রাণদণ্ড দিয়েছেন সেদিনই লাল কালিতে একটা ক্রস দিয়ে রেখেছেন। মাঝে মাঝে ক্রসের সঙ্গে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন রয়েছে। সেটাতে বুঝতে হবে প্রাণদণ্ড দিয়ে নিজেরই মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে এটা ঠিক হল কি না। এখন কী করছেন জানেন? ওঁর যে ডাক্তার–মজুমদার-তিনি ভাল মিডিয়ম—তাঁর সাহায্যে প্লানচেট করছেন, আর ফাঁসির আসামিদের আত্মাদের ডেকে এনে তাদের জিজ্ঞেস করছেন, তারা সত্যিই খুন করেছিল। কিনা। আত্মা যদি বলে যে হ্যাঁ, সে সত্যিই খুন করেছিল, তা হলে উনি খানিকটা নিশ্চিন্তবোধ করেন; এখন পর্যন্ত ওর জাজমেন্টে কোনও ভুল বেরোয়নি।

আপনারা কি এখানে এসেও প্ল্যানচেট করবেন নাকি?

সেই জন্যেই তো ডাক্তারকে একই হাউসবোটে রেখেছেন। ওর অ্যানজাইনাটা এখন অনেকটা কন্ট্রোলে এসেছে। আসলে ডাক্তার সঙ্গে এসেছেন প্ল্যানচেটের জন্য।

আজ রাত্রেও কি আপনাদের প্ল্যানচেট হবে।

আজ হয়তো হবে না, কিন্তু দু-এক'দিনের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে নিশ্চয়ই।.. কেন বলুন তো?

আমি ইন্টারেস্টেড, বলল ফেলুদা। অবশ্যি উনি আমার উপস্থিতি বরদাস্ত করবেন। কিনা সেটা একটা প্রশ্ন।

সেটা আমি বলে দেখতে পারি। উনি আপনার প্রতি বেশ প্রসন্ন সেটা আমি এর মধ্যেই বুঝেছি। আর এমনিতে প্ল্যানচেটের ব্যাপারে উনি কোনও গোপনতা অবলম্বন করেন। না। যা ফলাফল হয়, সবই তো ওঁর আত্মজীবনীতে যাবে। আমি তো সম্পূর্ণ রেকর্ড রাখছি।

তা হলে আপনি একটু জিজ্ঞেস করে জানাবেন।

নিশ্চয়ই।

আমরা চা খাওয়া শেষ করে আরও কিছুক্ষণ গল্প করে নিজেদের বোটে চলে এলাম। বৈঠকখানায় ঢুকে সোফায় ধাপ করে বসে পড়ে লালমোহনবাবু বললেন, হাইলি ইন্টারেস্টিং ম্যান—দিস জজ সাহেব।

ইন্টারেস্টিং তো বটেই, বলল ফেলুদা, তবে উনিই একমাত্র জজ নন, যাঁর এইরকম প্রতিক্রিয়া হয়েছে। এ রকম ঘটনা দেশে-বিদেশে আগেও শোনা গেছে।

ভাল কথা-আপনার সঙ্গে আমার পারমিশনটাও চেয়ে রাখবেন। প্ল্যানচেট দেখার সুযোগ ছাড়া যায় না।

৩

দেখতে দেখতে চার দিন কেটে গেল। এর মধ্যে এক'দিন শহরটা ঘুরে দেখলাম। লালমোহনবাবু একটা হটশট ক্যামেরা কিনেছেন, তাই দিয়ে পটাপট ছবি তুলছেন। সেগুলো শহরের মাহাত্তা অ্যান্ড কোম্পানিতে ডেভেলপ আর প্রিন্ট

করে দেখা গেল মন্দ ওঠেনি। যদিও লালমোহনবাবুর নিজের মন্তব্য হাইলি প্রেফেশনাল মোটেই মানা যায় না।

নিশাদবাগ, শালিমার আর চশমা শাহিও এক সকলে বেরিয়ে দেখে এলাম। মনটা চলে গেল। সেই জাহাঙ্গির শাজাহানের আমলে। এই ট্রিপটা আমরা করেছিলাম মল্লিক ফ্যামিলির সঙ্গে, ফলে তাদের সঙ্গে আলাপটাও আরও জমে উঠল। সিদ্ধেশ্বরবাবু ফেলুদাকে বললেন, আপনি শুনছি। আমার প্ল্যানচেট সম্বন্ধে কৌতুহল প্রকাশ করেছেন। আপনি প্ল্যানচেটে বিশ্বাস করেন?

আমার মনটা খুব খোলা, জানেন, বলল ফেলুদা।প্ল্যানচেট, স্পিরিচুয়ালিজম ইত্যাদি। সম্বন্ধে আমি অনেক পড়েছি; পরলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যে সম্ভব সেটা বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি বলে গেছেন; সেক্ষেত্রে প্ল্যানচেট সম্বন্ধে অবজ্ঞা প্রকাশ করার কোনও মানে হয় না। তবে যেমন সব কিছুর মধ্যেও থাকে তেমনই এর মধ্যেও ধাপ্পাবাজি চলে। আসলে মিডিয়ম যদি খাঁটি হয় তা হলেই ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে।

ডাঃ মজুমদার ইজ এ ফাস্ট রেট মিডিয়াম। আপনি এক'দিন বসে দেখুন না।

হ্যাঁ, কিন্তু আমার বন্ধু আর আমার ভাইও আসতে চায়।

মনে বিশ্বাস থাকলে কোনও লোকের আসাতেই আমার আপত্তি নেই। আজই আসুন। ভাল কথা, আমি কাদের আত্মা নামাচ্ছি জানেন তো?

যে সব লোককে আপনি প্রাণদণ্ড দিয়েছেন তাদের তো?

হ্যাঁ! আমি জানতে চাইছি। আমার জাজমেন্টে কোনও ভুলে হয়েছে কি না। এখন পর্যন্ত সে রকম ভুল পাইনি।

আপনারা রোজ একটি করে আত্মা নামান?

হ্যাঁ। একটার বেশিতেডাক্তারের ষ্ট্রেন হয়।

তা হলে কটায় আসব?

আসুন রাত দশটায়! ডিনারের পর বসা যাবে। তখন চারিদিকটা বেশ নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

ডিনারের পর আমরা মিঃ মল্লিকের হাউসবোটে গিয়ে হাজির হলাম। বসবার ঘরে প্ল্যানচেটের ব্যবস্থা হয়েছে। একটা টেবিলকে ঘিরে পাঁচটা চেয়ার রাখা হয়েছে; বুঝলাম চেয়ারগুলো খাবার ঘর থেকে আনা হয়েছে। আমরা আর সময় নষ্ট না করে কাজে লেগে গেলাম। মিঃ মল্লিক বললেন, আজ আমরা রামস্বরূপ রাউত বলে একটি বিহারি ছেলের আত্মাকে নামাব। এই ছেলেটির আজ থেকে দশ বছর আগে ফাঁসি হয়, এবং আমিই সে ফাঁসির জন্য দায়ী ছিলাম। আমার বিশ্বাস এর ফাঁসির দণ্ড হওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু জুরির ভার্ডিক্ট ছিল গিল্টি, আর খুনটাও ছিল একটু নৃশংস ধরনের। তাই আমি সাময়িক ভ্রান্তিবশত জেনেশুনেও প্রাণদণ্ডের আদেশ দিই। যদিও আমার মনে এই আদেশের যথার্থতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কেসটা এমন চতুরভাবে সাজানো হয়েছিল যাতে ছেলেটিকে অপরাধী বলেই মনে হয়।...মজুমদার তুমি তৈরি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

জানালার সব পর্যাদা টেনে দিয়ে ঘরটাকে একেবারে অন্ধকার করে দেওয়া হয়েছিল। আমরা সকলে যে যার জায়গায় বসেছি। আমার ডান দিকে ফেলুদা, বাঁ দিকে লালমোহনবাবু, ফেলুদার ডান পাশে মিঃ মল্লিক। আর তাঁর পাশে–লালমোহনবাবুর বাঁ দিকে–ডাঃ মজুমদার।

মিঃ মল্লিক গম্ভীরভাবে বললেন, ছেলেটির বয়স ছিল। উনিশ। শার্প চেহারা, ন্যাকের নীচে সরু গোঁফ, গায়ের রং পরিষ্কার। বিহারের ছেলে-নাম রামস্বরূপ রাউত। ছুরি দিয়ে খুনের মামলা, ঘটনাস্থল কলকাতার বাগবাজারের একটা গলি। ছেলেটিকে দেখে কিন্তু খুনি বলে মনে হয়নি। আপনারা নিজেদের কল্পনা অনুযায়ী একটা চেহারা স্থির করে নিয়ে তাতে মনঃসংযোগ করতে চেষ্টা

করুন। প্রশ্ন আমিই করব, উত্তর মজুমদারের মুখ দিয়ে আসামির কণ্ঠস্বরে বেরোবে।

পনেরো মিনিট এইভাবে অন্ধকারে বসে থাকার পরই বুঝলাম টেবিলটা আস্তে আস্তে নড়তে আরম্ভ করেছে। তার পর আরও জোরে দোলানি শুরু হল। আমি রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মিনিট খানেক পরে, মল্লিকমশাই প্রশ্ন করলেন–হিন্দিতে।

তুমি কে?

আমার নাম রামস্বরূপ রাউত।

ডাক্তারের গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল, কিন্তু কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ আলাদা। শুনে বেশ গ শিউরে ওঠে।

মিঃ মল্লিক আবার প্রশ্ন করলেন–

তোমার ফাঁসি হয়েছিল। ১৯৭৭ সালে?

হ্যাঁ।

আমি তোমার মৃত্যুদণ্ডের জন্য দায়ী, তা তুমি জানো?

জানি।

খুনটা কি তুমিই করেছিলে?

না।

তবে কে করেছিল?

ছেদিলাল। সে ভয়ানক ধূর্ত ছিল। তার অপরাধ সে অত্যন্ত চতুরভাবে আমার ঘাড়ে ফেলে। পুলিশ আমাকেই দাষী সাব্যস্ত করে।

আমি সেটা জানি। আমি তোমায় দেখেই বুঝেছিলাম যে তোমার দ্বারা এ খুন করা সম্ভব নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি তোমাকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করি।

সে নিয়ে এখন আর ভেবে কী হবে?

আমি চাই তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

সেটা আমি খুব সহজেই করতে পারি। তবে আমার আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে যারা জীবিত আছেন তারা ক্ষমা করবেন কি না জানি না।

তাদের কথা আমি ভাবছি না। তোমার ক্ষমাটাই আমার প্রয়োজন।

মৃত্যুর পর আর কারুর ওপর কোনও আক্রোশ থাকে না।

তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

মিঃ মল্লিক উঠে গিয়ে ঘরের বাতিটা জ্বলিয়ে দিলেন। ডাঃ মজুমদারের জ্ঞান আসতে আরও মিনিট দু-এক লাগল।

এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল বটে।

মনটা অনেকটা হালকা লাগছে, বললেন মিঃ মল্লিক, এই একটি মৃত্যুদণ্ডে যে আমি ভুল করেছিলাম, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। এবং এখন তো বুঝতেই পারছি যে আমার ধারণাই ঠিক।

ফেলুদা বলল, এই প্ল্যানচেট করে কি আপনি নিজের মনটাকে হালকা করতে চান?

শুধু তাই নয়, বললেন মিঃ মল্লিক, আমার মনে মাঝে মাঝে একটা সন্দেহ জাগে যে, আদৌ একজন মানুষ আরেকজনের প্রাণদণ্ড দিতে পারে কি না।

কিন্তু তা হলে খুনির শাস্তি হবে না?

হবে—কিন্তু প্রাণদণ্ডের দ্বারা নয়। কারাদণ্ড নিশ্চয়ই চলতে পারে। তা ছাড়া অপরাধীর সংস্কারের জন্য রাস্তা বার করতে হবে।

ঘড়িতে প্রায় এগারোটা বাজে, তাই আমরা উঠে পড়লাম। মল্লিক বলেন, আমরা গুলমার্গ যাচ্ছি। পরশু। আপনারা আসুন না। আমাদের সঙ্গে।

ফেলুদা বলল, সে তো খুব ভালই হয়। ওখানে কি থাকবেন?

এক রাত, বললেন ভদ্রলোক।গুলমার্গ থেকে খিলেন।মার্গ যাব।— তিন মাইল পথা— হেঁটেও যাওয়া যায়, ঘোড়াতেও যাওয়া যায়। তারপর ফিরে এসে

এক রাত থাকা। এখান থেকেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে; আমাদের ট্র্যাভেল এজেন্সিই আপনাদেরটাও করে দেবে।

সেই কথা রইল। আমরা তিনজনে আমাদের হাউসবোটে ফিরে এলাম।

ফেলুদা শুতে যাবার আগে বলল, মল্লিকমশাইয়ের ধারণাটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করা চলে না। একজন খুনির প্রাণদণ্ড হবে না সেটা মেনে নেওয়া কঠিন। ভদ্রলোকের আসলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশক্তির খানিকটা গোলমাল হয়ে গেছে। অবিশ্যি একজন জজের এটা হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

তবে ভেবে দেখুন, বললেন লালমোহনবাবু, এক কথায় একটা লোকের ফাঁসি হয়ে যাচ্ছে। কতখানি ক্ষমতা দেওয়া থাকে। একজন জজের হাতে। এই ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে পড়লে একজন বিবেকসম্পন্ন মানুষের মনে সংশয় আসতে পারে বইকী!

সেটা অবশ্য ঠিক, বলল ফেলুদা।

৪

শ্রীনগরের সঙ্গে গুলমার্গের কোনও মিলই নেই। এখানে হ্রদ, নদী, বাগ-বাগিচা ইত্যাদি কিছুই নেই; যা আছে, তা হল ঢেউ খেলানো পাহাড়ের গায়ে মসৃণ ঘন সবুজ ঘাস—যা দেখতে একেবারে মখমলের মতো; আর আছে ঝাউ বন আর পাইন বন আর ইতস্তত ছড়ানো কিছু কাঠের ঘর বাড়ি। সব মিলিয়ে ছবির মতো সুন্দর। এই পাহাড়ের গায়েই গলফ খেলা হয়। আর শীতকালে যখন ঘাস বরফে ঢেকে যায়। তখন স্কিইং হয়।

শ্রীনগর থেকে টাংমার্গ পর্যন্ত আঠাশ মাইল ট্যাক্সি করেই আসতে হয়, তারপর শেষের চড়াই চার মাইল যেতে হয় ঘোড়াতে। কলকাতায় থাকতেই ফেলুদা লালমোহনবাবুকে বলে দিয়েছিল যে কাশ্মীরে ঘোড়ায় চড়তে হবে। -ভয়

নেই, উটের চেয়ে অনেক সহজ। লালমোহনবাবু একেবারে পাকাপোক্ত রাইডিং ব্রিচেস করিয়ে এনেছিলেন। গুলমার্গে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বললেন ঘোড়া চড়ার মতো সহজ ব্যাপার আর নেই।

আমাদের সঙ্গে মল্লিক। মশাইরাও এসেছেন। আমরা আজকের রাতটা গুলমার্গে থেকে কাল এখান থেকে তিন মাইল দূরে আর দু হাজার ফুট ওপরে খিলেন।মার্গ দেখে বিকেলেই শ্রীনগর ফিরে যাব।

থাকার জন্য আমরা পাশাপাশি দুটো ক্যাবিন নিয়েছি। আমাদেরটা ছাট, ওদেরটা বড়। বিকেলে ক্যাবিনের বরাদ্দায় বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় তিনজন ভদ্রলোক এসে হাজির-সুশান্তবাবু, সিদ্ধেশ্বর মল্লিকের ছেলে বিজয়বাবু আর আরেকজন—যাকে আমরা চিনি না, সুপুরুষ চেহারা, টকটকে রং, বয়স ত্রিশ-বেত্রিশ। সত্যি বলতে কী, তিনজনেই মোটামুটি এক বয়সী।

সুশান্তবাবু নতুন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, এঁর নাম অরুণ সরকারী! ইনি কলকাতায় ব্যবসা করেন। আমাদের সঙ্গে এখানে এসে আলাপ। জুয়াড়িদের একজন বললে বোধহয় আপনার চিনতে আরও সুবিধে হবে।

সকলেই হেসে উঠল। সুশান্তবাবু বললেন, আমরা এসেছি কেন বোধহয় বুঝতেই পারছেন। প্রাইভেট ইনভেসটিগেটরের সঙ্গে আলাপ করতে এঁরা দুজনেই খুব ব্যগ্র। তা ছাড়া শুনছিলাম আপনার বন্ধু মিঃ গাঙ্গুলীও তো একজন নামী লেখক-ওঁর সর্ব বই-ই নাকি বেস্ট-সেলার।

লালমোহনবাবু মাথা হেঁট করে হেঁ হেঁ করে একটু বিনয়ের ভাব দেখালেন।

বিজয় মল্লিক আর অরুণ সরকারের খাতিরে ফেলুদাকে তার গোটা দু-তিন বিখ্যাত কেসের বর্ণনা দিতে হল। শেষ হয়ে যাবার পর সরকার ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি কাশ্মীরে এই প্রথম?

ফেলুদা বলল, হ্যাঁ, এই প্রথম। আমি কিন্তু আপনাকে প্রথমে দেখে কাশ্মীরি ভেবেছিলাম। আপনি বোধহয় এখানে আর একবার এসেছেন?

তা এসেছি, বললেন সরকার। ইন ফ্যাক্ট, আমার ছেলেবেলার কয়েকটা বছর শ্রীনগরেই কেটেছে। বাবা এখানে একটা হোটেলে ম্যানেজারি করতেন। তারপর বছর কুড়ি আগে আমরা কলকাতা চলে যাই।

এখানকার ভাষা আপনার জানা নেই?

তা অল্পবিস্তর আছে বইকী।

এবার ফেলুদা বিজয় মল্লিকের দিকে ফিরল!

আপনার বাবার প্ল্যানচেট সম্বন্ধে আপনার কোনও কৌতূহল নেই?

বিজয়বাবু বেশ জোরের সঙ্গে মাথা নেড়ে না বললেন।

বাবার ভীমরতি ধরেছে, বললেন বিজয়বাবু। একজন খুনি মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবে এর চেয়ে অন্যায়। আর কিছু হতে পারে না।

আপনি সে কথা বাবাকে বলেননি?

বাবার সঙ্গে আমার সে রকম সম্পর্ক নয়। উনি আমার বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করেন না, আমিও ওঁর ব্যাপারে কিছু বলি না।

আই সি।

তবে বাবা যা করছেন তা করে যদি শান্তি পান, তা হলে আমার বলবার কিছু নেই।

আপনার মা নেই?

না। মা বছর চারেক হল মারা গেছেন।

এক দাদা ছিল, আমেরিকায় ইঞ্জিনিয়ারিং করত, সে গত বছর মারা যায়। তার মেমসাহেব বউ আর এদেশে আসেনি। এক বোন আছে, তার স্বামী ভূপালে কাজ করে।

আমার বিশ্বাস আপনার কাশ্মীরের দৃশ্য সম্পর্কে খুব একটা কৌতূহল নেই।

কী করে বুঝলেন?

কারণ যে পরিমাণ সময় ঘরে বসে তাস খেলে কাটান।

আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার মনে কাব্য নেই। আমি কাঠখোট্টা মানুষ। আমার দু-একজন বন্ধু আর দু প্যাকেট তাস হলেই হল।

সরকার একটু হেসে বলল, আমি কিন্তু তাসও খেলি, আবার দৃশ্যও দেখি! সেটা বোধহয় ছেলেবেলায় কাশ্মীরে থাকার জন্য হয়েছে।

যাই হাক-বিজয়বাবু উঠে পড়লেন—আমাদের কিন্তু তাসের সময় হয়ে যাচ্ছে। আজ সুশান্তকে দলে টেনেছি। আপনারা কেউ—?

আমরা ভাবছিলাম একটু ঘুরতে বেরোব। আপনারা এখন কিছুক্ষণ খেলবেন তো?

এগারোটা পর্যন্ত তো বটেই।

তা হলে ফিরে এসে একবার ঢুঁ মারব।

বেশ। কাল আবার দেখা হবে।

তিন ভদ্রলোক গুডবাই করে চলে গেলেন। লালমোহনবাবু বললেন, এখন না বেরিয়ে আফটার ডিনার ওয়াকে বেরোলে ভাল হত না?

তথাস্তু, বলল ফেলুদা।

এখানে ক্যাবিনের সঙ্গে বাবুর্চি রয়েছে, তাকে বলে দিয়েছিলাম রাত্তিরে ভাত আর মুরগির কারি খাব। দেখলাম দিব্যি রান্না করে। সাড়ে আটটার মধ্যে খাওয়া হয়ে গেল। এত তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে না, তাই তিনজনেই বেশ উৎসাহের সঙ্গে রাতের গুলমার্গ শহর দেখতে বেরেলাম।

নিরিবিলি শহর, তার মধ্যে দিয়ে তিনজন হেঁটে চলেছি। পথে যে লোক একেবারে নেই, তা নয়। ভারতীয়দের মধ্যে বিদেশি টুরিস্টও মাঝে মাঝে চোখে

পড়ে। সত্যি বলতে কী, হিসেব নিলে বোধহয় বিদেশি টুরিস্টই সংখ্যায় বেশি হবে। লালমোহনবাবু এখনও গুনগুন করে গজল গাইছেন, খালি শীতের জন্য গল্যা মাঝে মাঝে অযথা গিটকিরি এসে যাচ্ছে।

শীত লাগছে? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

তা লাগছে, তবে মনে হয় খুব স্বাস্থ্যকর ঠাণ্ডা।

তা হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় এ সব জায়গায় বেশি রাত না করাই ভাল। চ তোপ্‌সে, ফেরা যাক।

আমরা উলটামুখে ঘুরলাম। শহর আর আমাদের ক্যাবিনের মধ্যে একটা ব্যবধান আছে। সেখানটা বসতি নেই বললেই চলে। আমরা সেই জায়গাটা দিয়ে হাটছি। এমন সময় হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটল। একটা কী জানি জিনিস শনশন শব্দে আমাদের মাথার পাশ দিয়ে গিয়ে রাস্তার ধারের একটা গাছের গায়ে লেগে মাটিতে পড়ে গেল। আমাদের মাথা বলছি, কিন্তু আসলে সেটা ঠিক ফেলুদার কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। ফেলুদার কাছে টর্চ ছিল, সেটা জ্বলিয়ে গাছের তলায় ফেলতেই দেখা গেল বেশ বড় একটা পাথর। সেটা ফেলুদার মাথায় লাগলো নির্ঘাত একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড হত।

প্রশ্ন হচ্ছে -কে এই লোকটা, যে এভাবে আক্রমণটা করল? আর এর কারণই বা কী? আমরা তো সবে এখানে এসেছি। এখনও গোলমেলে ব্যাপার কিছু ঘটেনি, তদন্তের কোনও প্রশ্নই উঠছে না, তা হলে এই হুমকির মানে কী?

ক্যাবিনে ফিরে এসে ফেলুদা গম্ভীরভাবে বলল, ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগছে না। আমাকে পছন্দ করছে না কেউ; এবং গোয়েন্দাকে হটানোর চেষ্টার একটাই কারণ হতে পারে—কোনও কুকীর্তি হতে চলেছে। অথচ সেটা যে কী, সেটা আন্দাজ করার কোনও উপায় নেই।

লালমোহনবাবু বললেন, আপনার সেই -৩২ কোল্ট রিভলভারটা আশা করি এনেছেন। ফেলুদা বলল, ওটা বাক্সেই রাখা থাকে। কিন্তু রিভলভার ব্যবহার করার সময় এখন এল কই? কোনও ক্রাইম তো ঘটেনি এখনও।

যাই হাক, রাত্তিরে দরজা-জানালা সব ভাল করে বন্ধ করে শুতে হবে। এখানে রিস্ক নেওয়া চলবে না। আশ্চর্য ব্যাপার মশাই!—আপনার সঙ্গে ছুটিতে কোথাও বেরোলেই কি গণ্ডগোল শুরু হবে?

ফেলুদা একটু ভেবে বলল, যাই, ওদের সঙ্গে একটু তাস পিটিয়ে আসি। আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফিরব। আপনারা শুয়ে পড়ুন।

৫

আগেই বলেছি যে খিলেনমার্গ যেতে হলে তিন মাইল পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে দু হাজার ফুট উপরে উঠতে হয়। আমরা দুই ক্যাবিনে বাসিন্দারা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম যে, তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট খেয়ে নটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ব। সেটাই করা হল।

আমাদের মধ্যে এক মিঃ মল্লিকই ঘোড়া নিলেন, আর সকলে হেঁটে যাওয়া স্থির করলাম। শুনেছি, পথের দৃশ্য অতি চমৎকার, আর দুপাশে অনেক ফুল গাছ।

লালমোহনবাবু বললেন, এই সাত দিনেই এনার্জি বেড়ে গেছে মশাই।হেঁটে দু হাজার ফুট পাহাড়ে ওঠাটা কোনও ব্যাপারই বলে মনে হচ্ছে না।

সত্যিই পথের দৃশ্য অপূর্ব। আমরা তিনজনে মোটামুটি একসঙ্গে হাঁটছি, বাকি ওদের দল ভাগ ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা দলে আছি সবসুদ্ধ ন জন—আমরা তিনজন, মিঃ মল্লিক, বিজয় মল্লিক, ডাঃ মজুমদার, সুশান্তবাবু, মিস্টার সরকার আর বেয়ারা প্রয়াগ।

প্রায় দু ঘণ্টা লাগল দু হাজার ফুট উঠতে; আর উঠেই এক আশ্চর্য দৃশ্য আমাদের হকচাকিয়ে দিল। আমরা একটা পাহাড়ের পিঠে এসে উপস্থিত হয়েছি, মাটিতে বরফ, সামনে বরফের পাহাড় আর উলটা দিকে ছড়িয়ে আছে গাছপালা নদী হ্রদ-সমেত দিগন্ত বিস্তৃত উপত্যক, আর তারও পিছনে আকাশের গায়ে যেন খোদাই করা রয়েছে নাঙ্গা পর্ব্বত।

ফেলুদা বলল, এই বোধহয় ক্লাইম্যাক্স। কাশ্মীরে এর চেয়ে সুন্দর আর কিছু আছে কি?

লালমোহনবাবু ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বার বার বলছেন, আসুন, একটা গ্রুপ তুলি, একটা গ্রুপ তুলি এই বরফের উপর দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ বাকি দল থেকে একটা শোরগোল শোনা গেল। সেটা একটা প্রশ্নের আকার নিয়ে আমাদের কানো এল।

মন্টু কই?

প্রশ্নটা করেছেন মিঃ মল্লিক, অত্যন্ত ব্যস্ত কণ্ঠে। বুঝতে অসুবিধা হল না যে মন্টু হল বিজয় মল্লিকের ডাকনাম। কারণ দলের মধ্যে একমাত্র তিনিই অনুপস্থিত।

কোথায় গেলেন ভদ্রলোক? এতই পিছিয়ে পড়েছেন কি? না, তা তো হতে পারে না। এরা একটু ছাড়াছাড়ি ভাবে হাঁটছিলেন ঠিকই, কিন্তু বিজয়বাবু কি একেবারে দলছুট হয়ে গিয়েছিলেন?

এবার সুশান্ত সোমের গলা শোনা গেল।আপনি এখানেই থাকুন মিঃ মল্লিক। আমরা নীচে খোঁজ করে আসছি।

যেমন কথা তেমন কাজ, আর এই অনুসন্ধানের পাটিতে আমরাও যোগ দিলাম।

যে পথ দিয়ে উপরে উঠেছি, এবার সেই পথ দিয়েই নেমে যাওয়া। আমার বুকের ভিতরটা টিপা-টিপ করছে। লোকটা গেল কোথায়?

সুশান্তবাবু গলা তুলে চিৎকার দিলেন।

বিজয়বাবু! বিজয়বাবু!

কোনও উত্তর নেই।

মিনিট পনেরো নামার পরেই হঠাৎ লালমোহনবাবু এক জায়গায় এসে থমকে থেমে গেলেন, তাঁর দৃষ্টি একটা ঝোপের দিকে।

ফেলুদা আর এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে দৌড়ে গেল ঝোপটার দিকে, কারণ পাতার ফাঁক দিয়ে একটা জুতো দেখা যাচ্ছে-পাহাড়ে ওঠার বুট।

মিঃ সোম, ফেলুদা হাঁক দিল।

মিঃ সোম দৌড়ে পৌঁছে গেল ফেলুদার পাশে, তার পিছনে বাকি চারজন।

ঝোপের পিছনে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন বিজয় মল্লিক।

ফেলুদা নাড়ি টিপেই বলল, হি ইজ অ্যালাইভ। মনে হয় মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

কাছেই একটা ঝরনা ছিল, তার থেকে অজিলা করে জল এনে মুখে ঝাপটা দিতে ভদ্রলোক চোখ খুলে এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন। তারপর অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করলেন, কোথায়–?

ফেলুদা এগিয়ে গিয়ে বলল, আপনার এ অবস্থা কী করে হল?

কেউ...ধাক্কা...

আপনি যেখানে পড়েছেন, মনে হয় আপনাকে অনেক উপর থেকে গড়িয়ে পড়তে হয়েছে।

হ্যাঁ

অজ্ঞানটা হয়েছেন এই গাছের গুঁড়িতে মাথা ঠোকা খেয়ে?

তাই হবে।

আপনি দেখুন তো উঠতে পারেন কি না।

ফেলুদা ভদ্রলোকের দু হাত ধরে নিজের কাঁধের উপর রেখে উঠে দাঁড়াল। একটু টলোমলো অবস্থার পর ভদ্রলোক দেখলাম নিজেকে সামলে নিলেন।

ফেলুদা এবার মাথাটা দেখে বলল, একটা জায়গায় চোট লেগেছে, রুক্ত বেরোয়নি, তবে জায়গাটা ফুলে গেছে। দু-তিন দিন একটু ভোগাবে আপনাকে। এখন আপনি ফিরে চলুন! একটা ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়। তা না হলে আস্তে আস্তে হেঁটে চলুন। পরে এক সময় আপনার সঙ্গে একটু কথা বলার ইচ্ছে রইল।

বিজয়বাবু এতক্ষণে মোটামুটি চাঙ্গা হয়ে গেছেন, কেবল দু-এক বার মাথার একটা বিশেষ জায়গায় আলতো করে হাত বোলালেন।

আমি মনে মনে ভাবছি।–ভদ্রলোকের এ দশা করল কে এবং কেন?

গুলমার্গ ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে গেল। আমরা যে যার ক্যাবিনে চলে গেলাম। ফেলুদা বলল, আগে একটু চা খাওয়া দরকার।

খানসামাকে চায়ের অর্ডার দেওয়ার পর লক্ষ করলাম ফেলুদার ভুরুটা অস্বাভাবিক রকম কুঁচকে আছে।

চায়ের পর দেখি বিজয়বাবু নিজেই এসে হাজির, সঙ্গে সুশান্তবাবু আর মিঃ সরকার।

বাধ্য হয়েই আপনার কাছে আসতে হল, বললেন বিজয়বাবু। আমি এত হতভম্ব আর কখনও হইনি।

আপনার উপর আক্রোশ থাকতে পারে এমন কেউ নেই এখানে?

কে থাকতে পারে বলুন! তা হলে তো সুশান্ত বা ডাঃ মজুমদার বা মিঃ সরকারের কথা বলতে হয়। সে তো হাস্যকর ব্যাপার হত!

কাশ্মীরে এসে পূর্বপরিচিত কারুর সঙ্গে দেখা হয়নি?

না।

কলকাতাতে এমন কেউ নেই। যার আপনার উপর কোনও আক্রোশ থাকতে পারে।

আমি তো সে রকম কারুর কথা জানি না।

আপনি তো কলকাতাতেই পড়াশুনা করেছেন?

হ্যাঁ।

গ্র্যাজুয়েট?

হ্যাঁ। স্কটিশ চার্চ কলেজ।

মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাট ছাত্রজীবন ছিল?

ঠিক তা বলা যায় না।

কেন?

কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে থাকতে কুসঙ্গে পড়ি, নেশা ধরি, ড্রাগস।

হার্ড ড্রাগস?

হ্যাঁ-কোকেন, মর্ফিন....

তারপর?

বাবা টের পেয়ে যান।

বাবা তো তখনও জজিয়তি করতেন?

হ্যাঁ।

তারপর?

তিনি আমার এই অভ্যাস ছাড়ানোর প্রাণান্ত চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। তারপর আশা ছেড়ে দেন।

এই অবস্থাতেও আপনি গ্র্যাজুয়েট হতে পেরেছিলেন?

আমি খুবই ভাল ছাত্র ছিলাম।

আপনি বাড়িতেই থাকতেন?

কিছু দিন ছিলাম, তারপরে আর পারিনি। বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। কানপুরে এক আশ্চর্য লোকের সংস্পর্শে আসি। সাধুই বলতে পারেন। নাম আনন্দস্বামী। তখনও আমি নেশায় মত্ত, কিন্তু ভদ্রলোকের সংস্পর্শে এসে আমার নেশা চলে যায়। একে মিরাকৃলি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না; আমি আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাই।

তারপর বাড়ি ফেরেন?

হ্যাঁ। বাবা আমার সমস্ত দোষ ক্ষমা করে দেন।

তখন আপনার বয়স কত?

সাতাশ-আটাশ হবে।

তারপর? আপনি চাকরি করেন?

বাবাই একটা ফার্মে ঢুকিয়ে দেন। আমি এখনও সেখানেই আছি।

আপনার জুয়ার প্রতি একটা আসক্তি আছে না?

তা আছে।

সেটা কোনও সমস্যার সৃষ্টি করছে না তো?

না।

আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করা যায় আপনার কোনও শত্রু আছে কি না, আপনি কী বলবেন?

যত দূর জানি, আমাকে খুন করতে চাইবে এমন কোনও শত্রু আমার নেই। ছাটখাটা শত্রু বোধহয় সকলেরই থাকে।–তার পিছনে ঈষা থাকতে পারে। এটা যে অস্বাভাবিক নয়, সেটা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।

একশোবার।..এবার আরও দু-এক জন সম্বন্ধে আপনাকে আরও দু-একটা প্রশ্ন করে নিই। ডাঃ মজুমদারকে আপনি ক'দিন থেকে চেনেন?

উনি আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান আজ প্রায় পনেরো বছর হল।

বেশ। এবার সুশান্তবাবুকে একটা প্রশ্ন।

সুশান্তবাবু বললেন, বলুন।

আপনি কতদিন হল মিঃ মল্লিকের সেক্রেটারির কাজ করছেন?

ওঁর রিটায়ার করার সময় থেকেই। তার মানে পাঁচ বছর।

বেয়ারা প্রয়াগ কত দিন আছে?

ও-ও আন্দাজ পাঁচ বছর। মিঃ মল্লিকের পুরনো বেয়ারা মকবুল হঠাৎ মারা যায়। তারপর উনি প্রয়াগকে রাখেন।

বেশ, আজ এই পর্যন্তই থাক। তবে পরে দরকার হলে আবার প্রশ্ন করতে পারি তো?

নিশ্চয়ই, বললেন বিজয়বাবু।

৬

কী মশাই, আবার যেই কে সেই?

শ্রীনগর ফিরে এসে আমরা সকালে বোটের উপরের ডেকে বসে চা খাচ্ছিলাম, এমন সময় লালমোহনবাবু মন্তব্যটা করলেন।

যেই কে সেই, বলল ফেলুদা।যা বুঝছি, ছুটি-ভোগ মানেই দুভোগ। ক্রাইম যেন আমাদের পিছনে ওত পেতে থাকে, একটু আরাম করলেই ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে এবার যে রকম হতভম্ব হয়েছি, সে রকম কখনও হয়েছি বলে মনে পড়ে না। কোনও খুঁটিই যেন খুঁজে পাচ্ছি না, যেটা ধরে একটু এগোব! সব অন্ধকার।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে চা-টা শেষ করে একটা চারমিনার ধরিয়ে বলল, সুশান্তবাবুকে বলতে হবে একবার যদি মিঃ মল্লিকের ডায়েরিগুলো দেন।

ও ডায়েরি দিয়ে আপনার কী লাভ? জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

কীসে কী কাজ দেয় তা আগে থেকে কেউ বলতে পারে? অবশ্য মিঃ মল্লিকের রাজি হওয়া চাই। সেটা সুশান্তবাবুকে একবার জিজ্ঞেস করতে হবে।

তা, সে তো এখনই পারেন-ওই তো সুশান্তবাবু।

সত্যিই দেখি, ভদ্রলোক শিকার করে বুলেভার্ডের দিক থেকে ফিরছেন, সঙ্গে কিছু খরিদ করা জিনিসপত্র।

ফেলুদা ডেকের রেলিং-এর পাশে ঝুঁকে পড়ে ডাক দিল।

ও মশাই, এক মিনিট এদিকে আসতে পারেন?

শিকারাটা আমাদের বোটের কাছে চলে এল। ফেলুদা বলল, মিঃ মল্লিকের ডায়েরিগুলো কি আপনি সঙ্গে এনেছেন?

সবগুলো, বললেন সুশান্তবাবু, চব্বিশটা আছে।

ওগুলো দু-তিনটে করে ধার নিতে পারি? মল্লিক ফ্যামিলি সম্বন্ধে আরেকটু জানতে না পারলে আমি এই নতুন পরিস্থিতির ঠিক কিনারা করতে পারছি না। আমার মনে হয় ডায়েরিগুলো পড়লে কিছুটা সুবিধা হতে পারে।

সুশান্তবাবু বললেন, আমি একবার সাহেবকে জিজ্ঞেস করি।

নিশ্চয়ই।

আমার মনে হয় না। উনি কোনও আপত্তি করবেন, কারণ আপনারা তো সবই শুনেছেন ওঁর মুখ থেকে।

আধা ঘণ্টার মধ্যে সুশান্তবাবু চারটে পুরনো ডায়েরি সঙ্গে নিয়ে আমাদের হাউসবোটে এসে হাজির; বললেন, এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, জীবনী যখন বেরোবে, তখন তো সবই জনাজানি হয়ে যাবে কাজেই এখন পড়তে দিতে আর কী আপত্তি থাকতে পারে? আর ক্রাইমের কথাই যদি হয়, তা হলে সবই তো খবরের কাগজের রিপোর্টে বেরিয়েছে।

ফেলুদা বলল, এগুলো দেখা হয়ে গেলে আর এক সেট আমি আপনার কাছ থেকে চেয়ে আনব!..তোপ্‌সে-তুই আর লালমোহনবাবু বরং যা, মানসবল লেকটা দেখে আয়। আমি এখন একটু ঘরে বসে কাজ করব।

ভাল কথা, বললেন সুশান্তবাবু, আপনারা পাহালগাম যাবেন না?

ইচ্ছে তো আছে।

কবে যাবেন? আমার মনে হয় আমাদের সঙ্গে গেলেই ভাল। আমরা পরশু যাচ্ছি।

ভেরি গুড।

মানসবল লেকের মতো স্বচ্ছ জল আমি আর কোনও লেকে দেখিনি; জলের একেবারে তল অবধি উদ্ভিদ দেখা যায়। ভারী অদ্ভুত লাগে দেখতে।

লালমোহনবাবু দৃশ্য উপভোগ করলেন ঠিকই, কিন্তু বুঝতে পারছিলাম, মাঝে মাঝে ওঁর ফেলুদার তদন্তের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। একবার বললেন, তোমার দাদা ওই ডায়েরিগুলো পড়ছেন কেন জানি না। যাদের একবার ফাঁসি হয়ে গেছে তারা তো আর খুনখারাপি করতে পারবে না।

আমি বললাম, সেটা ফেলুদাকেই বুঝতে দিন না।

মানসবল শ্রীনগর থেকে আঠারো মাইল দূরে; আমাদের ফিরতে ফিরতে হয়ে গেল সন্ধ্যা সাড়ে ছটা। ফেলুদা দেখলাম বৈঠকখানার সোফায় বসে তখনও ডায়েরি নিয়ে পড়ছে। বলল, সারা দিনে বারোটা ডায়েরি পড়ে শেষ করেছে এবং সব কটাই নাকি ইন্টারেস্টিং।

কোনও কাজ হল কি? জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

ফেলুদা বলল, কাজ কীসে হয়, সেটা অনেক সময় আগে থেকে বোঝা যায় না। আপাতত আমার কাজ হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ করা। নতুন তথ্য কিছু বেরিয়েছে—শুধু ডায়েরি থেকে নয়। যেমন বিজয়বাবু বলেছেন যে সেদিন যে উনি ঘাড়ে ধাক্কা খেয়েছিলেন তখন একটা ঠাণ্ডা, ধাতব স্পর্শ অনুভব করেছিলেন।

আমার মতে সেটা আংটি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। তবে তাতেও যে খুব সুবিধে হচ্ছে তা নয়, কারণ আংটি এখানে তিনজন পারেন-সুশান্তবাবু, মিঃ সরকার আর প্রয়াগ। আর যদি এ দলের বাইরে কেউ থাকে তা হলে তো চমৎকার। তা হলে আমাদের কোনও তদন্তই কাজ দেবে না।

কিন্তু সে রকম দল কি বেশি ছিল? জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু!

তা ছিল না ঠিকই।

আমার তো একটিও মনে পড়ছে না।

একটি ছিল-পাঞ্জাবি দল–তবে তাদের পাঁচজনের মধ্যে তিনজনই ছিল ঘোড়ার পিঠে।

আশা করি আর কোনও গোলমাল হবে না।

আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। ভূস্বর্গে এসে এ সব ঝামেলা ভাল লাগে না-বিশেষ করে যখন বুদ্ধি খাটাবার কোনও স্কোপ পাওয়া যাচ্ছে না।

*

পাহালগাম যাবার আগে আমরা শ্রীনগরে আর এক'দিন ছিলাম, তার মধ্যে ফেলুদা মিঃ মল্লিকের বাকি ডায়েরিগুলো পড়া শেষ করে ফেলল।

কী বুঝলেন? জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

ফেলুদা বলল, অন্তত ছটা প্রাণদণ্ড সম্পর্কে উনি নিশ্চিত যে সেগুলো অন্যায়ভাবে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলোতে তিনি ভুল করেছেন। এই ছটা কেসেই কারাদণ্ড দেওয়া উচিত ছিল। একটি বিশেষ কেস-সেখানে আবার আসামি হচ্ছেন কাশ্মীরি, নাম সঙ্গু–সেখানে ফাঁসির হুকুম দেওয়ার পরে মল্লিকের খুব অনুশোচনা হয়। তারপরেই অবিশ্যি ওঁর অ্যানজাইনার পেইন আরম্ভ হয় এবং উনি কিছু দিনের মধ্যে রিটায়ার করেন।

পাহালগাম শ্রীনগর থেকে ষাট মাইল। লিন্দার উপত্যকায় ছোট্ট শহর। এক পাশ দিয়ে খরস্রোতা লিদর নদী বয়ে গেছে। তাতে সাহেবরা ট্রাউন্ট মাছ

ধরে। শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে বরফের পাহাড় দেখা যায়। আগে এখানে হোটেল-টোটেল ছিল না, এখন অনেক হয়েছে। তবে এখনও ইচ্ছে করলে তাঁবু ভাড়া নিয়ে নদীর ধারে থাকা যায়। আমরা সেভাবেই থাকব বলে ঠিক করলাম।

চারটে ট্যাক্সি করে আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম। চমৎকার পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে বারোটার মধ্যে আমরা পাহলগাম পৌঁছে গোলাম। শহরটা একপেশে; নদীর পশ্চিম দিকে শুধু পাহাড়, বাড়ি ঘরদের কিছুই নেই। আর পুব দিকে পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে আছে হোটেল, রেস্টোর‍্যান্ট, দোকানপাট নিয়ে ছবির মতো শহর।

আমাদের তাঁবুর জন্য আগেই বলা ছিল, গিয়ে দেখি যে তাঁবু খাটাকার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। এ তাঁবু স্পেশাল ধরনের মজবুত তাঁবু, এতে ডাইনিং রুম, বেডরুম, অ্যাটাচড বাথরুম সবই আছে। আমাদের একটা তাঁবু আর মল্লিকদের দুটো। সামনে বিশ হাতের মধ্যে দিয়ে তোড়ে বয়ে চলেছে। লিন্দর নদী, তার একটানা শব্দ কখনও থামে না; লালমোহনবাবু হলিউডের ছবির কথায় চলে গেলেন; বললেন, মশাই, একমাত্র ওয়েস্টার্ন ছবিতেই এ রকম আউটডোর লাইফ দেখেছি; আমাদের আবার কোনও দিন এরকমভাবে থাকতে হবে, ভাবতে পারিনি।

দুপুরে তাঁবুতে লাঞ্চ খেয়ে (এখানেও সঙ্গে কিচেন রয়েছে) সবে বাইরে বেরিয়েছি। এমন সময় দেখি সুশান্ত সোম আমাদের তাঁবুর দিকে আসছেন।

লাঞ্চ শেষ? জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

হ্যাঁ, বলল ফেলুদা।

এখান থেকে আট মাইল দূরে চন্দনওয়াড়ি বলে একটা জায়গা আছে জানেন তো?

যেখানে একটা বরফের ব্রিজ আছে-যেটা সারা বছর থাকে?

হ্যাঁ।

সেটা দেখতে যাবার মতলব করছেন নাকি?

গেলে সবাই একসঙ্গে গেলেই তো ভাল হয়?

তবে আজই সবে এলাম, আজ ভাবছিলাম পাহালগামটাই ঘুরে দেখব। চন্দনওয়াড়ি কাল গেলে হয় না?

আমাদেরও সেই আইডিয়া। আমি শুধু আপনাদের ইনভাইট করতে এলাম।

ফেলুদা বলল, অবশ্যই একসঙ্গে যাব। আমাকে ছাড়া বোধহয় আপনাদের আর চলবে না। এর মধ্যেই যা একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড ঘটে গেল। এটাকে তো অ্যাটেমটেড় মার্ডার ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। বিজয়বাবুর খুব ভাগ্য ভাল যে, উনি বেঁচে গেলেন।

তা হলে কাল দুটো নাগাদ যাওয়া যাক। এখান থেকে আট মাইল ঘোড়া করে যেতে হয়। লাঞ্চ করে বেরিয়ে পড়া যাবে।

প্রয়াগ। প্রয়াগ? মিঃ মল্লিক ডাকতে ডাকতে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর চোখে ভ্রূকুটি। এদিকে প্রয়াগ সামনেই নদীর ধারে হাত-মুখ ধুচ্ছে।

বোধহয় নদীর শব্দের জন্য শুনতে পাচ্ছে না, বলল ফেলুদা।

না, বললেন মিঃ মল্লিক, ও এমনিতেই কানো একটু খাটা, তিনবার না ডাকলে উত্তর দেয় না?

প্রয়াগ এবার ডাক শুনে মনিবের কাছে দৌড়ে গেল।

যাও, আমার, লাঠিটা নিয়ে এসো।

হুজুর, বলে প্রয়াগ তাঁবুর ভিতর চলে গেল।

কিছুক্ষণ থেকেই দেখছিলাম ফেলুদা প্রয়াগকে একদৃষ্টি লক্ষ করছে। কেন, সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ইতিমধ্যে অন্য তাঁবুটা থেকে বিজয়বাবু আর মিঃ সরকারও বেরিয়ে এসেছেন। সরকার এঁদের সঙ্গ ছাড়েননি। মনে হয় পুরো টুরটাই এঁদের সঙ্গে ঘুরবেন।

আমরা কাল চন্দনওয়াড়ি যাচ্ছি, বললেন সুশান্তবাবু।

সকলে প্রস্তাবে সায় দিল।

ফেলুদা বলল, তোরা দুজনে ডেক-চেয়ার নিয়ে নদীর ধারে বসে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ কর, আমি একটু পাহাড়ি পথে ঘুরে আসি। মাথাটা একটু পরিষ্কার করা দরকার।

কতক্ষণের জন্য যাবে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

এই ঘণ্টাখানেক, বলল ফেলুদা।

সঙ্গে আপনার বিশ্বস্ত অস্ত্রটি আছে তো?

তা আছে।

ফেলুদা চলে গেল।

লালমোহনবাবুর মাথায় একটা নতুন গল্পের প্লট এসেছে, সেটা আমাকে শুনিয়ে পরখ করে দেখে নিলেন। আমি আবার কিছু ইমপ্রুভমেন্ট সাজেস্ট করলাম। এই করতে করতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বেরিয়ে গেল। নদীর ধারে বসে থাকলে বোরিং লাগে না, তাই সময়টা বেশ কেটে যাচ্ছিল, এমন সময় লালমোহনবাবু বললেন, দু ঘণ্টা হতে চলল, তবু তোমার দাদা এলেন না–

সত্যিই তো! এটা আমার খেয়ালই হয়নি।

কী করা যায়, বলো তো?

ফেলুদার সঙ্গে থেকে থেকে আমারও অভ্যোস হয়ে গেছে মুহূর্তে ডিসিশন নেবার।

আমি উঠে পড়লাম।

চলুন, ওকে খুঁজতে বেরোই।

চলো।

ফেলুদা কোন রাস্তা ধরেছে সেটা আমরা জানতাম। আমরা দুজনে সেই পাহাড়ি পথে চড়াই ধরে রওনা দিলাম। পাইন বনের মধ্যে দিয়ে পথ, পরিবেশ চমৎকার, কিন্তু আমাদের সে সব উপভোগ করবার মতো মনের অবস্থা নেই। ফেলুদা বলেছিল এক ঘণ্টায় ফিরবে; এ বিষয়ে ওর কথার নড়াচড় হয় না। কিছু একটা গণ্ডগোল নিশ্চয়ই হয়েছে।

আধা ঘণ্টা হাঁটার পরেই যা খুঁজছিলাম, তা পেয়ে গেলাম। একটা ঝোপের ধারে মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে ফেলুদা। আমার গলা মুহূর্তে শুকিয়ে গেল।

লালমোহনবাবু পালস ধরেই বললেন, বেঁচে আছেন—কোনও চিন্তা নেই।

ফেলুদাও নড়েচড়ে উঠল। তার পরেই উঠে বসে মাথার পিছনে হাতটা দিয়ে মুখটা বিকৃত করে বলল, এবার মিস করেনি রে। একেবারে মোক্ষমভাবে লক্ষ্যভেদ।

উঠতে পারবে?

নিশ্চয়ই। ব্যথা তো মাথায়।

ফেলুদা উঠে পড়ে আমাদের দুজনের কাঁধে ভর করে কয়েক পা হেঁটে বলল, ঠিক হ্যায়, হাঁটতে পারব।

কিন্তু কাউকে কি দেখতে পেলেন?

তা হলে তো তদন্ত ফুরিয়ে যেত। সে লোক অত কাঁচা নয়। কটা দিন যাক। আর একটু মাথা না খাটালে চলছে না।

রাত্তিরে মিঃ মল্লিকের তাঁবুতে আবার প্ল্যানচেট হল। বলা হয়নি, এর মধ্যে শ্রীনগরে আর এক'দিন প্ল্যানচেট হয়েছিল যাতে আমরাও উপস্থিত ছিলাম। শাসমল বলে এক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আত্মা এসে বলল যে, সে সত্যিই খুন করেছিল।

আজকের প্ল্যানচেটে ফেলুদা ডায়েরি পড়ে যার কথা বলেছিল, সেই কাশ্মীরি মিঃ মনোহর সপুর আত্মা নামানো হল। আশ্চর্য মিডিয়ম ডাঃ মজুমদার-দেশ মিনিটের মধ্যেই আত্মা চলে আসে।

সপুর আত্মা প্রশ্ন করল, আমাকে কেন ডেকেছ?

মিঃ মল্লিক বললেন, তোমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলাম আমি। যে খুনের মামলার আমি ছিলাম জজ।

সেটা আমি জানি।

আমার বিশ্বাস হয়েছিল খুনটা তুমি করেনি।

খুন করেছিল হরিদাস ভগত। পুলিশ ভুল তদন্ত করেছিল। কিন্তু এখন আর তাতে কিছু এসে যায় না।

কিন্তু আমি যে সেই সেভেনটি এইট থেকে দুশ্চিন্তায় ভুগছি।

তুমি কি আমার কাছে ক্ষমা চাও?

হ্যাঁ।

বেশ, করলাম তোমাকে ক্ষমা। কিন্তু আমার যেসব আত্মীয়বন্ধু জীবিত আছে, তারা তোমায় ক্ষমা করেনি বা করবে না।

তাতে কিছু যায় আসে না। আমি তোমার ক্ষমা চাই।

বেশ, ক্ষমা করলাম। আমি আসি।

প্ল্যানচেট শেষ হল!

মিঃ মল্লিক। আবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

আমরা নিজেদের তাঁবুতে ফিরে এলাম।

বালিশে মাথা রাখার দশ মিনিটের মধ্যেই ঘুম এসে গেল।

৭

সকালে কাঁধ ধরে ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখি ফেলুদা। তার মুখের ভাব দেখেই বুঝলাম কোনও একটা গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে।

মিঃ মল্লিক খুন হয়েছেন।

অ্যাঁ।

এবার আমার চিৎকারে লালমোহনবাবুরাও ঘুম ভেঙে গেল।

কাল মাঝরাত্তিরে, বলল ফেলুদা। বুকে ছুরি মেরেছে। শুধু তাই না, খুনটাকে আরও পাকা করার জন্য মাথায়ও একটা ভারী কিছু দিয়ে মেরেছে। সব মিলিয়ে বিশ্রী ব্যাপার।

এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। লালমোহনবাবুও উঠলেন। গায়ে দুটো গরম কাপড় চাপিয়ে দুজনেই তাঁবুর বাইরে চলে এলাম। ফেলুদা আমাদের খবরটা দিয়েই আবার বেরিয়ে গেল। মিঃ মল্লিক খুন! ব্যাপারটা আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। মনের মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

বাইরে দেখি সকলেই প্রায় তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, সকলেরই মুখ কালো। কথাবাতায় বুঝলাম বিজয়বাবু পুলিশকে খবর দিতে গেছেন। এখান থেকে শহর বেশি দূর নয়, তাই পুলিশ আসতে বেশি সময় লাগা উচিত না।

ডাঃ মজুমদারই সকলে উঠে প্রথমে ব্যাপারটা দেখেন। বিছানার চাদর রক্তাক্ত। সেটা ছুরির আঘাতের ফলে, কারণ মাথায় বিশেষ রক্তপাত হয়নি। অস্ত্রটা অবশ্য পাওয়া যায়নি। মনে মনে বললাম, এমন চমৎকার লিন্দর নদী থাকতে অস্ত্র ফেলার জায়গার অভাব কোথায়? নদী এখন সে ছুরিকে ভাসিয়ে ভাসিয়ে কোথায় নিয়ে গেছে কে জানে?

তবে শুধু যে খুন তা নয়; তার সঙ্গে চুরিও আছে। মিঃ মল্লিকের ডান হাতের অনামিকায় একটা বহুমূল্য হিরের আংটি ছিল—তাঁর এক গুজরাটি মক্কেলের দেওয়া। খুনি সেইটিও খুলে নিয়ে গেছে।

ফেলুদা ডাঃ মজুমদারকে প্রশ্ন করছিল।

কাল প্লাত্রে ভদ্রলোক শুয়েছেন কখন?

আমাদের অনেক আগে। উনি নটার মধ্যে খেয়ে শুয়ে পড়তেন।

আপনি তো ডাক্তার, দেখে বুঝতে পারছেন না। কখন খুনটা হয়েছে?

মনে হয় রাত দুটো-আড়াইটে নাগাদ; তবে সেটা পুলিশের ডাক্তার এলে আরও সঠিকভাবে বলতে পারবে।

রাত্রে কোনও শব্দটব্দ শোনেননি? ঘুমের কোনও ব্যাঘাত হয়নি?

উঁহু। আমার সচরাচর এক ঘুমে রাত কাবার হয়ে যায়। আমি একটু তাড়াতাড়ি উঠি। সাড়ে ছাঁটায় উঠেই দেখি এই কাণ্ড। আমার আগে প্রয়াগ উঠেছিল, কিন্তু ও এই দুর্ঘটনাটা লক্ষ করেনি। ও উঠেই তাঁবুর বাইরে চলে গিয়েছিল।

কে খুন করতে পারে, সে সম্বন্ধে আপনার কোনও ধারণা আছে?

একেবারেই না।

একটা পুলিশের জিপ এসে তাঁবুর কাছে থামল। বিজয়বাবু নামলেন, তাঁর পিছনে একজন ইনস্পেক্টর। বিজয়বাবুর নির্দেশ অনুযায়ী ইনস্পেক্টরটি এগিয়ে গেলেন মিঃ মল্লিকের তাঁবুর দিকে।

আমার নাম ইনস্পেক্টর সিং, বললেন ভদ্রলোক। আমি এই কেসটার চার্জ নিচ্ছি। হোয়্যার ইজ দ্য ডেডবডি?

বিজয়বাবু মিঃ সিংকে নিয়ে তাঁবুর ভিতর ঢুকলেন। আমরা বাইরেই রয়ে গেলাম।

ইনস্পেক্টরের পিছন পিছন। কয়েকজন কনস্টেবল, ফোটোগ্রাফার ইত্যাদি এসব ব্যাপারে। যেমন হয়ে থাকে ঠিক তেমনি ভাবেই কাজ শুরু করে দিল। এ জিনিস অনেকবার দেখেছি, তাই কৌতুহল মিটে গেছে। আর মিঃ মল্লিকের মৃতদেহ দেখবার কোনও ইচ্ছে আমার ছিল না। খালি মনে হচ্ছিল—কী আশ্চর্য এই মল্লিক কতজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন, আর হয়তো কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর হত্যাকারীরও মৃত্যুদণ্ড হবে।

ফেলুদা একা এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে দেখে লালমোহনবাবু তার দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,কী ব্যাপার বলুন তো?

ফেলুদা বলল, আমার মনের ভিতরের জটটা আরও বেশ ভাল করে পাকিয়ে গেল—এই তো ব্যাপার! এখন পুলিশ যদি কিছু করতে পারে।

আপনি নিজে কি হাল ছেড়ে দিলেন?

তা কি হয়? আমি তো প্রথম থেকে সবগুলো ঘটনাই দেখেছি; পুলিশ তো আর তা দেখেনি। অবিশ্যি ঘটনাগুলোর পরস্পরের সঙ্গে কোনও যোগসূত্র আছে কিনা সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। আমাকে যে পাথর ছুড়ে মেরেছিল, আর বিজয়বাবুকে যে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিল, দুজনেই কি এক লোক? আর সেই লোকই কি এই খুনটা করেছে? হিরের আংটি চুরি যদি মোটিভ হয়ে থাকে, তা হলে হয়তো বাইরের থেকে খুনটা করে থাকতে পারে। কিন্তু–

ফেলুদা চুপ করে গেল। তারপর কিছুক্ষণ পরে বলল, ডাকাতির আইডিয়াটাকে অবিশ্যি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমাদের চেনা লোকই কুকীর্তিটা করেছে।

চেনা লোক বলতে—?

মিঃ মল্লিকের সঙ্গে যারা এসেছেন। ইনকুডিং, মিঃ সরকার। কারণ তাঁর ডান হাতের আঙুলে S লেখা আংটিটার কথা ভুললে চলবে না।

ইনস্পেক্টর সিং তাঁবু থেকে বাইরে বেরোলেন। ভদ্রলোক তিনটে তাঁবুর দিকে দেখিয়ে বললেন, এই সবগুলোই কি একই পার্টির তাঁবু?

বিজয়বাবু বললেন, না; এই দুটো আমাদের, আর ওইটা মিঃ মিত্তিরদের।

মিঃ মিত্তির?

হি ইজ এ ওয়েলনোন প্রাইভেট ইনভেসটিগেটর ফ্রম ক্যালকাটা।

মিঃ সিং ভুকুঞ্চিত করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, আপনি কি রাজগড়ের খুনের কেসটা সল্‌ভ করেছিলেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মিঃ সিং হাত বাড়ালেন। করমর্দনের জন্য।

ইনস্পেক্টর বাজপাই ইজ এ ভেরি গুড ফ্রেন্ড অফ মাইন। তার কাছে আপনার খুব প্রশংসা শুনেছি। আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলাম।

ফেলুদা বলল, আমি কিন্তু এখানে ঘটনাচক্রে এসে পড়েছি। কোনও কেস-টেস সালভ করতে নয়। আপনি আপনাদের কাজ চালিয়ে যান।

আমি তো চালিয়ে যাবই আমার কাজ, কিন্তু আপনিই বা চুপচাপ বসে থাকবেন কেন, বিশেষ করে এই ফ্যামিলির সঙ্গে যখন আপনার আলাপ হয়েছে। খুনটা তো বাইরের ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছে। ছুরি যে বসিয়েছে সে তো লেফট হ্যান্ডেড; এখানে তো সবাই দেখছি রাইট হ্যান্ডেড। যাই হাক, ইউ আর ফ্রি টুঁ ক্যারি অন ইওর ওন ইনভেস্টিগেশন।

অনেক ধন্যবাদ। আসলে আমার উপরও একটা অ্যাটেমাট হয়েছিল, কাজেই আমি ব্যাপারটাকে খুব ঠাণ্ডা মাথায় নিতে পারছি না।

ভাল কথা, মিঃ সিং বিজয়বাবুর দিকে ফিরলেন।ডেড বডির কী হবে? ওটা কি আপনি কলকাতায় নিয়ে যেতে চান?

তার কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। আমি ছাড়া তো বাবার আর কেউ নেই। মা মারা গেছেন, দাদা বিলেতে ছিলেন, দাদাও মারা গেছেন।

ভেরি ওয়েল, তা হলে এখানেই সৎকার হাক। তবে, বুঝতেই পারছেন, আপনাদের এখনও কিছু দিন পাহালগামে থাকতে হবে। অন্তত যত দিন না কেসটার সুরাহা হচ্ছে তত দিন। কারণ ইউ আর অল আন্ডার সাসপিশন। আমি একে একে প্রত্যেককেই জেরা করতে চাই।

৮

পুলিশ ঘণ্টা তিনেক ধরে জেরা চালাল। জেরা শুরু করার আগে মিঃ সিং ফেলুদাকে দু-একটা প্রশ্ন করে নিলেন। আপনি কাল রাত্রে কোনও সন্দেহজনক শব্দ পাননি?—

না। তা ছাড়া এখানে নদীর শব্দে অন্য সব শব্দ চাপা পড়ে যায়।

জানি। সেটা ক্রিমিন্যালের পক্ষে একটা অ্যাডভানটেজ। ভাল কথা, আপনার বন্ধুর সঙ্গে তো আলাপ হয়নি।

ইনি মিঃ গাঙ্গুলী। হি ইজ এ রাইটার।

এর পর আমরা তিনজন শহরের দিকে গিয়ে একটা রেস্টোরান্টে বসে চা আর আমলেট খেলাম। সকালে গোলমালো আর ব্রেকফাস্ট হয়নি।

খেতে খেতে লালমোহনবাবু বললেন, সবচেয়ে আশ্চর্য দেখছি যে প্রথমে ছেলেকে খুন করতে চেষ্টা করে না পেরে শেষটায় বাবাকে খুন করল।

ফেলুদা বলল, সেটা যে একই লোক করেছে, তার কী গ্যারান্টি? একজনের ছেলের উপর আক্রোশ থাকতে পারে, আরেকজনের বাপের উপর। নাট ভেরি সরপ্রাইজিং।

আমার কিন্তু একটি লোক সম্বন্ধে কী রকম সন্দেহ হয়।

কে?

ডাঃ মজুমদার। এদিকে ডাক্তার, তার উপরে আবার আত্মা নামাচ্ছে। কম্বিনেশনটা অদ্ভুত লাগছে।

খুন করার সুযোগ অবশ্য ডাক্তারেরই বেশি ছিল, কারণ পাশের খাটে ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু মোটিভ কী? হিরের আংটি যদি নেওয়া উদ্দেশ্য হয়, তা হলে বলতে হয় ডাক্তারের খুবই আর্থিক দুরবস্থা। কিন্তু সেরকম তো কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না।

আর বিজয়বাবু?

বিজয়বাবু অবশ্য তাঁর বাপের মৃত্যুতে খুবই লাভবান হবেন। অবিশ্যি মিঃ মল্লিক। যদি উইল করে থাকেন, এবং সে উইল থেকে যদি ছেলেকে বাদ দিয়ে থাকেন, তা হলে বিজয়বাবুর কোনওই লাভ নেই। তা না হলে বিজয়বাবু মোটা টাকা পাবেন, কারণ মিঃ মল্লিক। নিঃসন্দেহে ধনী ব্যক্তি ছিলেন।

কিন্তু বিজয়বাবু তো তাঁর অফিস থেকে রোজগার কাছেনই। তাঁর হঠাৎ এতটা টাকার দরকার পড়বে কেন যে, সে খুন করবে? খুন করা তো চাট্টিখানি কথা নয়।

দ্যাট ইজ ট্রু।

সুশান্ত সোম সম্বন্ধে কী মনে হয় আপনার?

কাজের ছেলে সে বিষয় কোনও সন্দেহ নেই। আর বেশ কোয়ালিফাইড। মিঃ মল্লিক সুশান্তবাবুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতেন। আর সুশান্তবাবুর কোনও খুনের মোটিভ খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

আচ্ছ মিঃ মল্লিকের উপর কি কেউ প্রতিশোধ নিয়ে থাকতে পারে?

তা তো পারেই। আমি তো সেই কথাটাই ধার বার ভাবছি। কত জনের প্রাণ নিয়েছেন লোকটা, ভেবে দেখুন।

কিন্তু বিজয়বাবুর বেলা তো প্রতিশোধ খাটে না।

তা তো খাটেই না, আর সেই ব্যাপারেই বার বার ধাক্কা খেতে হচ্ছে।

দুপুর বেলা লাঞ্চের পর ফেলুদা বলল, একটু শহরের দিকে ঘুরে আসবে। একটু না হাঁটলে নাকি ওর মাথা খোলে না।

শহর হোক আর যাই হাক, সঙ্গে আপনার অস্ত্রটি রাখবেন, বললেন লালমোহনবাবু।

আমরা দুজন নদীর ধারে গিয়ে বসলাম।

সুশান্তবাবু তাঁবু থেকে বেরিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, বললেন ভদ্রলোক।

আমরাও সায় দিলাম। সত্যিই, এমন যে হবে তা ভাৰতেও পারিনি।

ইনস্পেক্টর কী বলেন? জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

সুশান্তবাবু বললেন, যদ্দুর মনে হল, ডাকাতের সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না। আংটিটার বিস্তর দাম ছিল, মাঝখানে হিরে বসানো, তাকে গোল করে পান্না দিয়ে ঘেরা। আর এখানে যে ডাকাতির কেস একেবারে হয় না তা নয়। যত টুরিস্ট বাড়ছে, তত এসবও নাক বাড়ছে। বছর ত্রিশোক আগে পাহালগম অনেক নিরাপদ জায়গা ছিল।

আপনারা কি তাঁবুতে বন্দি? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

না, বললেন সুশান্তবাবু, তবে পাহালগাম ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলবে না।

মৃতদেহের সৎকার হবে কখন?

বিকেলের মধ্যেই।

বিকেলে জানতে পারলাম যে, মল্লিকরা ব্রাহ্ম ছিলেন। তাই বিজয়বাবুকে আর অশৌচ পালন করতে হবে না।

ফেলুদা পাঁচটার মধ্যে ফিরে এল। ও যতক্ষণ না ফিরছিল। ততক্ষণ আমার অসোয়াস্তি লাগছিল, কিন্তু ও বলল, যারা ওর পিছনে লাগতে পারত, তারা সকলেই এখন পুলিশের নজরে রয়েছে। তাই চিন্তা নেই।

কিন্তু এই যে ঘুরে এলেন, এর কোনও ফল পেলেন?

পেয়েছি বইকী, বলল ফেলুদা, তবে এখানে বসে থেকে সব ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হবে। না। আমাকে একবার শ্রীনগর যেতে হবে।

কবে যাবেন?

কালই সকলে।

আর আমরা?

আমার দু দিন আন্দাজ লাগবে। সে দু দিন আপনারা এখানেই থাকবেন। চেঞ্জের পক্ষে এর চেয়ে ভাল জায়গা তো আর হয় না।

কিছু আলো দেখতে পেলেন?

তা পেয়েছি। সত্যিই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

কিন্তু এখনও কিছুটা অন্ধকার রয়েছে।

সেই জন্যেই তো শ্রীনগর যাওয়া দরকার। তবে যাবার আগে আমার দিক থেকেও কয়েকজনকে একটু জেরা করা দরকার। নিচু স্তর থেকে ওপরে ওঠাই ভাল। আগে প্রয়াগকে কয়েকটা প্রশ্ন আছে।

সুশান্তবাবুকে দিয়ে খবর পাঠাতেই প্রয়াগ তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল।

বোসে এখানে, বলল ফেলুদা।

প্রয়াগ এখন আমাদের তাঁবুতে।

শোনো প্রয়াগ, বলল ফেলুদা, তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব, তুমি তার ঠিক ঠিক জবাব দেবে।

পুছিয়ে বাবু।

কথাবাতা হিন্দিতেই চলল, আমি বাংলায় লিখছি।

তুমি মল্লিকসাহেবের বাড়িতে কবে থেকে আছ?

পাঁচ বছর হয়েছে।

তার আগে কোথায় ছিলে?

জেকবসাহেবের বাড়িতে বেয়ারার কাজ করতাম। পার্ক স্ট্রিটে।

আমি জেকবসাহেবের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে মল্লিকসাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। জেকবসাহেব বিলেত চলে যাচ্ছিলেন, তাই আর আমাকে দরকার লাগছিল না।

মল্লিকসাহেব জেকবসাহেবকে চিনতেন?

ওরা দুজনে এক ক্লাবের মেম্বার ছিলেন।

তোমার পুরো নাম কী?

প্রয়াগ মিসির।

তোমার সংসার নেই?

বউ মারা গেছে, মেয়ে দুটোর বিয়ে হয়ে গেছে।

কাল রাত্রে তুমি কোনও রকম শব্দ পাওনি, যার জন্য তোমার ঘুম ভেঙে যেতে পারে?

না বাবু।

বাবুকে কে খুন করতে পারে, তাই নিয়ে তোমার কোনও ধারণা আছে?

না বাবু। এ রকম হবে আমি কল্পনাই করতে পারিনি।

ঠিক আছে, তুমি এখন যেতে পার।

এবার ফেলুদা সুশান্তবাবুকে বলল ডাঃ মজুমদারকে খবর দিতে।

ডাঃ মজুমদার এলেন আমাদের তাঁবুতে।

ফেলুদা বলল, আমি আপনাকে দু-একটা প্রশ্ন করতে চাই।

করুন।

মিঃ মল্লিক যেভাবে প্ল্যানচেট করেছিলেন, সেটা কি ডাক্তার হিসাবে আপনার কাছে খুব স্বাভাবিক বলে মনে হয়?

ডাঃ মজুমদার মাথা নাড়লেন।

না। আমি ওঁকে অনেকবার বলেছি যে, এই সব পুরনো ব্যপার নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভাল। আর জজ যদি এক-আধটা ভুল ভার্ডিক্ট দিয়ে থাকে, তাতেই বা কী এসে গেল। ভুল তো সকলেরই হতে পারে।

আপনার নিজের মধ্যে যে ক্ষমতাটা রয়েছে, সেটা কবে থেকে প্রকাশ পেল?

তা অনেক দিন। পাঁচিশ বছর তো বটেই।

ওঁকে কে খুন করতে পারে সে সম্বন্ধে আপনার কোনও ধারণা আছে?

একেবারেই নেই।

ওঁর ছেলে সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?

ছেলে এক কালে ড্রাগসের প্রভাবে খুব গোলমালের মধ্যে পড়েছিল। আমি অনেক চেষ্টা করেও কিছু করতে পারিনি। কিন্তু সেই সাধুর প্রভাবেই হাক, আর অন্য কোনও কারণেই হোক, ও একেবারে স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

জুয়ার প্রতি ওর আসক্তি রয়েছে না?

সেটা সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারব না, কারণ আমি ও রসে একেবারেই বঞ্চিত।

ও কোন অফিসে কাজ করে?

চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোং–ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট।

কোথায় অফিস?

গণেশ এভিনিউ। দশ নম্বর।

ঠিক আছে। আপনি যেতে পারেন।

ডাঃ মজুমদার চলে গেলেন। সুশান্তবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলেন ফেলুদার দিকে।

এবার মিঃ সরকারের সঙ্গে একটু কথা বলব।

মিঃ সরকার?

সুশান্তবাবু যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

ফেলুদা বলল, হ্যাঁ। কেন, আপনার অবাক লাগছে?

উনি তো ঠিক আমাদের দলের মন; এক রকম বাইরের লোক!

তাঁর যে টাকার দরকার নেই সেটা আপনি কী করে জানলেন সুশান্তবাবু? টাকার জন্য মানুষে খুন করে না?

ঠিক আছে। আমি ডাকছি ওঁকে।

মিঃ সরকার এলেন।

আসুন, বসুন, বলল ফেলুদা।

কাশ্মীর এসেছিলাম বেড়াতে, আর কীসের থেকে কী হয়ে গেল দেখুন।

কী করবেন বলুন-মানুষের কপালই ওই রকম।

এখন বলুন, আমাকে কী জিজ্ঞেস করতে চান।

আপনি কত বছর পর্যন্ত শ্রীনগরে ছিলেন?

বছর বারো।

তারপর কলকাতায় যান?

হ্যাঁ।

সেইখানেই পড়াশুনা করেন?

হ্যাঁ।

আপনার বাবা কি কলকাতাতেও হোটেল ম্যানেজারি করতেন?

হ্যাঁ।

কোন হোটেল

ক্যালকাটা হোটেল।

আপনি গ্র্যাজুয়েট?

বি কম।

এখন কী করেন।

একটা ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে আছি।

কোম্পানির নাম?

ইউনিভারসাল ইনসিওরেন্স।

আপিস কোথায়?

পাঁচ নম্বর পোলক স্ট্রিট।

আপনি জজ মিঃ মল্লিকের কথা জানতেন?

না। এখানে এসে আলাপ। বিজয়ের সঙ্গে অনেক ব্যাপারে মিলে গেল, তাই একটা

আপনি কি জুয়ার ভক্ত?

হঠাৎ কাশ্মীর আসার ইচ্ছে হল কেন?

ক' দিনের জন্য এসেছেন?

দশ দিন—তবে এখন কী হয় জানি না। এরকমভাবে আটকে পড়বা কে জানত !

আপনার হাতের আংটিটা একবার দেখতে পারি?

নিশ্চয়ই।

সরকার তাঁর আংটিটা খুলে ফেলুদার হাতে দিলেন, সোনার আংটি, উপরে একটা ছ কোনা

পাতের উপর মিনে করে নীলের উপর সাদা দিয়ে। S লেখা।

ফেলুদা ধন্যবাদ দিয়ে আংটিটা ফেরত দিয়ে দিল।

ঠিক আছে। আপনার জোরা শেষ।

থ্যাঙ্ক ইউ।

৯

পরদিন সকলে ফেলুদা ব্রেকফাস্টের পর ট্যাক্সি নিয়ে শ্রীনগরে চলে গেল। বলল, মনে হচ্ছে, পরশু ফিরে আসতে পারব; তবে দু-এক দিন দেরি হলে চিন্তা করিস না।

ন'টা নাগাত পুলিশের জিপ এল, ইনস্পেক্টর সিং নামলেন। অন্য তাঁবুতে কাজ শেষ করে ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

হায়্যার ইজ মিঃ হোমস? হেসে প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

আমি বললাম ফেলুদা একটু শ্রীনগর গেছে।

এই কেসের ব্যাপারে?

হ্যাঁ।

কিন্তু তার প্রয়োজন হচ্ছে কেন? এই কেস তো জলের মতো সোজা।

কী রকম? বেয়ারাটাই হচ্ছে অপরাধী। তার সুযোগ ছিল। সে একই তাঁবুতে শুত। তা ছাড়া এসব লোকের লোভ হওয়াটা স্বাভাবিক। বেয়ারাগিরি করে আর কত রোজগার হয়?

আপনি কি ওকে অ্যারেস্ট করছেন? লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

আপাতত থানায় নিয়ে যাচ্ছি জেরার জন্য। তা ছাড়া, ও যে লেফট হ্যান্ডেড তাও প্রমাণ হয়ে গেছে। ওকে ওর নাম লিখতে বলেছিলাম। ডান হাতে লিখতেই পারল না, কিন্তু বাঁ হাতে বেশ পারল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও অস্বীকার করছে, সুতরাং ওকে বেশ ভাল রকম জেরা করা দরকার।

আংটিটাও পেতে হবে, বললেন জটায়ু।

সেটাও জেরার জোরে বেরিয়ে যাবে। পুলিশের পক্ষে খুঁজে পাওয়া তো মুশকিল। এই পাহাড়ি পরিবেশে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে কে জানে?

ফেলুদা কি তা হলে বৃথাই গেল শ্রীনগর? কেসটা এতই সোজা? আমার কিন্তু তা বিশ্বাস হচ্ছিল না। অত সহজ হলে ফেলুদা অত কাঠখড় পাড়াত না। আমি জানি ও কলকাতায় খোঁজ করবে। ওর লোক আছে যাদের বলে দিলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওরা যে কোনও খবর জোগাড় করে দিতে পারে।

কিন্তু তার পরেই আবার মনে হয়ে যাচ্ছে বেয়ারা লেফট-হ্যান্ডেড।

কিন্তু এত সাহস হবে লোকটার? ও কি জানে না যে ওর ওপরেই প্রথমে সন্দেহ পড়বে?

ইনস্পেক্টর সিং বিদায় নিয়ে প্রয়াগকে সঙ্গে করে চলে গেলেন। লোকটাকে দেখে আমার কষ্ট হল, কারণ ও কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিয়েছে। পুলিশরা স্বীকারোক্তি আদায় করবার জন্য কত কী যে করতে পারে সে আমার জানতে বাকি নেই। ফেলুদাও এ নিয়ে বহুবার আক্ষেপ করে বলেছে। ও বলে পুলিশরা কাজ জানে, ওরা কর্মঠ, কিন্তু দয়ামায়া বলে কিছু নেই ওদের মধ্যে! অবিশ্যি উপায়ও নেই। অনেক সময় জরুরি তথ্য সংগ্রহ করতে কড়া রাস্তা নিতে হয়। সে কাজটা প্রাইভেট গোয়েন্দার চেয়ে পুলিশে অনেক বেশি ভাল পারে।

সুশান্তবাবু এবার দেখি আমাদের দিকে আসছেন। বললেন, মিঃ মিত্তির তো বোধহয় শ্রীনগর গেছেন।

আমি হ্যাঁ বলতে বললেন, আমরা কিছু না বলতেই উনি আমাদের জন্য এত করছেন, এটা খুব আশ্চর্য বলতে হবে।

আসলে উনি এটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছেন। রহস্য জিনিসটা ওঁর কাছে অসহ্য। যতক্ষণ না সেটার কিনারা করতে পারছেন, ততক্ষণ ওঁর সোয়াস্তি নেই।

লালমোহনবাবু বললেন, আপনি কি মিঃ মল্লিকের জীবনী লিখতে আরম্ভ করে দিয়েছিলেন?

তা এক রকম দিয়েছিলাম বইকী। খানিকটা করে লিখছিলাম, আর উনি সেটা দেখে দিচ্ছিলেন। খুবই চিত্তাকর্ষক বই হত বলে মনে হয়।

এখন তো কাজটা বন্ধ হয়ে গেল।

তা তো হলই।

আপনিও কি প্রয়াগকে সন্দেহ করেন?

মাটেই করিনি। ওর অত সাহস হবে বলেই আমার মনে হয়নি। কিন্তু পুলিশ যেভাবে চলছে...

মিঃ মিত্তিরের উপর আরেকটা অ্যাটেমাট হয়ে গেছে, সেটা বোধহয় জানেন না?

সে কি?

হ্যাঁ। এবার মাথায় বাড়ি মেরেছিল পাথর-টাথর কিছু দিয়ে। সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে। কিন্তু কেউ যে ওর উপস্থিতি পছন্দ করছে না, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

তা, উনি তো পুলিশ প্রোটেকশন নিতে পারেন।

প্রস্তুত।

আপনাদের তাঁস খেলা বন্ধ বোধহয়? লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

মৃত্যুর ছায়া এখনও ঘনিয়ে আছে; এর মধ্যে কি ও সব চলে?

তা বটে।

*

ফেলুদার জন্য প্রাণটা ছটফট করছে, অথচ দ্বিতীয় দিনেও ও এল না। দিনটা আমরা সাইট সিইং-এ কাঁটালাম। টুরিস্ট আপিস থেকে খবর নিয়ে আড়াই মাইল দূরে শিকারগী লেক আর এক মাইল দূরে একটা পুরনো শিবমন্দির দেখে

এলাম। তাঁবুতে থাকার চেয়ে দূরে থাকাই ভাল বুঝতে পারছিলাম। কারণ তাঁবুকে ঘিরে এখনও খুনের গন্ধ, ভাবতে গেলেই বুক ধড়ফড় করে।

তৃতীয় দিন সকাল দশটায় ভাবছি কী করা যায়, এমন সময় ফেলুদার ট্যাক্সি এসে হাজির। আমরা দুজনেই উদ্‌গ্রীব হয়ে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। ও হাত তুলে বলল, সবুরে মেওয়া ফলে।

আপনার মাথা পরিষ্কার কি না সেইটে শুধু বলে দিন, বললেন লালমোহনবাবু।

পরিষ্কার, তবে অনেক জট ছাড়াতে হয়েছে। এমন একটা কেস সচরাচর পাওয়া যায় না।

সেটা ইনস্পেক্টর সিং-এর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করতে হবে।

উনি কিন্তু খুনি ধরে ফেলেছেন এর মধ্যেই। মানে?

বেয়ারা প্রয়াগ।

সর্বনাশ! তা হলে তো আর সময় নষ্ট করা চলে না। আমি চললাম থানায়।

ফেলুদা আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে শহরের দিকে চলে গেল।

ও যখন ফিরল। তখন আমাদের লাঞ্চ খাবার সময় হয়ে গিয়েছে। এসে বলল, আজি তিনটেয় মিটিং। ওঁদের তাঁবুতে।

আমার বুকটা কেঁপে উঠল। ফেলুদার রহস্যোদঘাটন যে না দেখেছে সে কল্পনা করতে পারে না সেটা কত নাটকীয় হতে পারে।

তিনটের পাঁচ মিনিট পরেই পুলিশের জিপ এসে গেল। ইনস্পেক্টর সিং ফেলুদার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, আপনি কি বিশ্বাস করতে পারেন যে একজন পুলিশ ইনস্পেক্টর ক্রাইম স্টোরির ভক্ত হতে পারে?

আপনি ওসব বই পড়েন নাকি?

ও ছাড়া আর কিছুই পড়ি না। বিশেষ করে প্রাইভেট ডিটেকটিভের গল্প হলে তো আর কথাই নেই। আজ। আপনার রহস্যোদঘাটনের ব্যাপারেও আমার পড়া অনেক গল্পের কথা মনে পড়ছে। অবিশ্যি আপনি যে কী বলতে যাচ্ছেন সে সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা নেই।

সেটা তো অল্পক্ষেণের মধ্যেই জানতে পারবেন।

তাঁবুতে সকলে জমায়েত। দুটো তাঁবু থেকে চেয়ার এনে সকলের বসবার জায়গা করা হয়েছে। বিজয় মল্লিক, মিঃ সরকার, সুশান্ত সোম, ডাঃ মজুমদার— এঁরা সব চেয়ারে বসেছেন, আর তাবুর এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে বেয়ার প্রয়াগ। এই শেষের লোকটির চেহারার মধ্যে একটা ক্লিষ্ট ভাব দেখে মনে হয় পুলিশ তাকে বেশ ভালভাবেই জেরা করেছে।

১০

ফেলুদা তার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একবার সকলের দিকে দেখে নিল। তারপর এক গেলাস জল ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে নিয়ে খেয়ে তার কথা শুরু করল–

মিঃ মল্লিক আজ আমাদের মধ্যে নেই, আমি তাঁকে দিয়েই আমার কথা আরম্ভ করছি। সিদ্ধেশ্বর মল্লিক। ত্রিশ বছর জজিয়তি করে তারপর কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এই রিটায়ারমেন্টের কারণ ছিল অসুস্থতা। তা ছাড়া হয়তো মিঃ মল্লিক। তাঁর পেশায় কিছুটা বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। প্রাণদণ্ড নিয়ে হয়তো তাঁর মনে একটা সংশয় দেখা দিয়েছিল। আমি এই সিদ্ধান্তের সত্যতা-অসত্যতার ভিতর যেতে চাইছি না। যা ঘটেছিল শুধু তাই বলছি।

মিঃ মল্লিক, দৈনিক ডায়েরি লিখতেন। এই ডায়েরির একটা বিশেষত্ব ছিল। যে দিন তিনি কাউকে ফাঁসির আদেশ দিতেন, সেই দিন ডায়েরিতে

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিটির নাম লিখে তার পাশে লাল কালিতে একটা ক্রস দিয়ে দিতেন। আর যে দিন এই দণ্ডের যথার্থতা সম্বন্ধে তাঁর মনে একটা গভীর সন্দেহ দেখা দিত, সেদিন ক্রসের পাশে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে দিতেন।

আমি মিঃ মল্লিকের ডায়েরিগুলি দেখেছি। সবসুদ্ধ ছটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন রয়েছে। তার মানে ছটি প্রাণদণ্ডের সমীচীনতা সম্পর্কে তিনি সন্দিগ্ধ ছিলেন।

এইবার আমি আরেক দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মিঃ মল্লিকের মনে দ্বন্দ্ব হচ্ছিল কি না হচ্ছিল সেটা সম্বন্ধে জনসাধারণ কিছুই জানতে পারত না। কিন্তু যারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হচ্ছে, তাদের আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া নিয়ে কি মিঃ মল্লিক কখনও ভেবেছিলেন? মনে তো হয় না, কারণ তাঁর ডায়রিতে এর কোনও উল্লেখ নেই। ছেলের মৃত্যুদণ্ডে বাপ-মা কী ভাবছে, বাপের মৃত্যুদণ্ডে ছেলের বা ভাইয়ের বা স্ত্রীর বা অন্য আত্মীয়-স্বজনের কী মনোভাব হতে পারে, সেটা নিয়ে মিঃ মল্লিক বোধহয় কখনও চিন্তা করেননি। কিন্তু আমরা একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারব যে, এই সব প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব অনেকেই নিশ্চয়ই গভীর বেদনা অনুভব করেছে।

এইটো উপলব্ধি করার পরেই আমার মনে প্রশ্ন জাগে–এই রকম প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কোনও ব্যক্তির আত্মীয়ই কি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মিঃ মল্লিককে হত্যা করে?

যত ভাবি, ততই মনে হয় এটা খুবই স্বাভাবিক। বিশেষ করে যেখানে দণ্ড সম্বন্ধে জজের মনেও সন্দেহ আছে, সেখানে তো বটেই।

এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে—এই ঘরে যারা উপস্থিত আছেন, তাদের মধ্যে কি এমন ব্যক্তি কেউ আছেন?

এখানে প্রথমেই যাকে বাদ দেওয়া যায়, তিনি হলেন ডাঃ মজুমদার, কারণ তিনি আজ পনেরো বছর হল মল্লিকদের পরিবারিক চিকিৎসক।

বাকি থাকেন। আর চারজন-বিজয় মল্লিক, সুশান্ত সোম, মিঃ সরকার আর বেয়ারা প্রয়াগ।

এখানে বিজয় মল্লিককে এই বিশেষ তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। কারণ তাঁর কোনও আত্মীয়ের প্রাণদণ্ড হয়নি।

সেই রকম সুশান্ত সোমকেও এই একই মর্মে বাদ দেওয়া যেতে পারে। কারণ তাঁরাও কোনও নিকট জনের প্রাণদণ্ডের কথা আমরা ডায়েরিতে পাচ্ছি না।

বাকি রইলেন মিঃ সরকার ও প্রয়াগ বেয়ারা।

এখানে প্রয়াগকে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই।

প্রয়াগ চুপ করে দাঁড়িয়ে বইল।

ফেলুদা বলল, প্রয়াগ, সে দিন তুমি যখন নদীতে হাত ধুচ্ছিলে, তখন আমি তোমাকে লক্ষ করছিলাম। তোমার ডান হাতে একটি ছোট্ট উলকি আছে—দুটি ইংরেজি অক্ষর-HR। এটার মানে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই।

প্রয়াগ গলা খাকরিয়ে নিয়ে বলল, ওর কোনও মানে নেই বাবু। উলকি করাবার ইচ্ছা হয়েছিল তাই করিয়েছিলাম।

তুমি বলতে চাও এটা তোমার নাম আর পদবির প্রথম অক্ষর নয়?

নেহি বাবু। মেরা নাম হ্যায় প্রয়াগ মিসির।

আমি যদি বলি তোমার নাম প্রয়াগ নয়। কারণ প্রয়াগ বলে ডাকলে তুমি চট করে উত্তর দাও না-অথচ অন্য ব্যাপারে মোটেই তুমি কালা নও।

আমার নাম প্রয়াগ মিসির, বাবু।

না! ফেলুদা চেঁচিয়ে উঠল। আমি জানতে চাই ওই R অক্ষরটা কীসের আদ্যক্ষর। কী পদবি তোমার?

আমি আর কী বলব বাবু!

সত্যি কথাটা বলবে। এখানে জীবন-মরণ নিয়ে খেলা হচ্ছে, এখানে মিথ্যা চলবে না।

তবে আপনিই বলুন।

আমি বলছি। ওই R হচ্ছে রাউত। এবার তোমার পুরো নামটা বলে। প্রয়াগ হঠাৎ কেমন জানি ভেঙে পড়ল। তারপর কান্নার মধ্যেই বলল, ও আমার একমাত্র ছেলে ছিল বাবু। আর ও খুন করেনি। ওর মামলা এমনভাবে সাজানো হয়েছিল, যাতে ওকে খুনি বলে মনে হয়। আমার একমাত্র ছেলে-ফাঁসি হল!

তা হলে তোমার পুরো নামটা কী দাঁড়াচ্ছে?

হনুমান রাউত, বাবু। কিন্তু আমি বাবুকে খুন করিনি, ওঁর আংটি আমি নিইনি!

সেটা কি আমি একবারও বলেছি?

তা হলে বাবু আমাকে মাপ করে দিন।

পুরোপুরি মাপ করা কি চলে? সত্যি কথা বলে তো।

হনুমান রাউত কেমন যেন ফ্যালফ্যাল করে ফেলুদার দিকে চাইল।

ফেলুদা বলল, তুমি খুন করনি, কিন্তু খুনের চেষ্টা করেছিলে।

না বাবু—

আলবৎ! ফেলুদা গর্জিয়ে উঠল। তোমার নিজের ছেলের মৃত্যুর জন্য যিনি দায়ী, তুমি তাঁর ছেলেকে মারতে চেয়েছিলে যাতে তিনিও তোমার মতো পুত্রশোক ভোগ করেন। খিলেন।মার্গ যাবার পথে তুমি বিজয়বাবুর ঘাড়ে ধাক্কা মারোনি? ঠিক করে বলে তো। বাঁ হাতে তোমার আংটি রয়েছে, আর বা হাত দিয়ে তুমি ডান হাতের কাজ কর, তাই না?

কিন্তু উনি তো বেঁচে আছেন বাবু; উনি তো মরেননি।

খুনের অভিপ্রায়েরও শাস্তি আছে হনুমান রাউত—সে শাস্তি তোমাকে ভোগ করতে হবে!

দুজন কনস্টেবল এসে বেয়ারকে ঘর থেকে নিয়ে গেল।

ফেলুদা আরেক গেলাস জল খেয়ে নিল। তারপর আবার শুরু করল—এবারে আমরা অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছি। এটা আরও অনেক বড় প্রসঙ্গ। এখানে একজন ব্যক্তির প্রাণ নেওয়া হয়েছে! এ হল হত্যা। আর এর জন্য আমার মতে প্রাণদণ্ডই উচিত দণ্ড।

সকলে একদৃষ্টি ফেলুদার দিকে চেয়ে আছে। তাঁবুতে পিন পড়লে তার শব্দ শোনা যেত নিশ্চয়ই যদি না বাইরে লিন্দর নদীর স্রোতের অবিশ্রান্ত শব্দ থাকত।

ফেলুদা বলল, আমি একজনকে এর আগেও কয়েকটা প্রশ্ন করেছি–এবার আরেকবার করতে চাই। মিঃ সরকার।

সরকার নড়েচড়ে বসে বললেন, করুন।

ফেলুদা বলল, আপনি কবে শ্রীনগর এলেন?

আপনাদের সঙ্গে একই ফ্লাইটে এলাম।

আচ্ছা, আপনার আঙুলের আংটির Sটা কীসের আদ্যক্ষর?

আমার পদবির অফিকোর্স-সরকার। কিন্তু, মিঃ সরকার, আমি ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসে খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে, সেদিন যাত্রীর তালিকায় সরকার বলে কেউ ছিলেন না। সেন ছিলেন, দুজন সেনগুপ্ত ছিলেন, একজন সিং ছিলেন আর একজন সপ্রু ছিলেন।

বাট-বাট-

বাট হোয়াট, মিঃ সরকার? আপনার নাম বদলানোর দরকার হল কেন জানতে পারি কি?

মিঃ সরকার চুপ।

ফেলুদা বলল, আমি বলি? আমার ধারণ আপনি মনোহর সপ্রুর ছেলে। আপনার চেহারার মধ্যে একটা পরিষ্কার কাশ্মীরি ছাপ রুয়েছে। মিঃ মল্লিক

মনোহর সপ্রুকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। মিঃ মল্লিককে প্লেনে দেখেই আপনি নাম বদল করার সিদ্ধান্ত নেন, কারণ তখন থেকেই আপনার মনে প্রতিশোধের ইচ্ছা জাগে। আপনি ওই ফ্যামিলির সঙ্গে মিশে যান, এবং সুযোগ খুঁজতে থাকেন-টু স্ট্রাইক। সেই সুযোগ আসে পাহালগামে।

কিন্তু...কিন্তু...দিস ক্রাইম ইজ কমিটেড বাই এ লেফট-হ্যান্ডেড পার্সন।

আপনি ভুলবেন না, মিঃ সপ্রু-আমি আপনাকে তাস বাঁটতে দেখেছি। আর কেউ লক্ষ না করলেও আমি করেছি যে, আপনি বাঁ হাতে তাস ডিল করেন।

মিঃ সপু হঠাৎ কেমন যেন খেপে উঠলেন।

বেশ, ঠিক কথা-আমি ওঁকে ছুরি মেরেছি, কিন্তু তার জন্য আমার একটুও অনুশোচনা নেই। আমার যখন মাত্র পনেরো বছর বয়স তখন উনি আমার বাবাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলান–অ্যান্ড মাই ফাদার ওয়াজ নট গিল্টি! কিন্তু...কিন্তু...

সঙ্গুরা যেন হঠাৎ একটা নতুন কথা মনে পড়ল।

আমি ওঁর আংটি তো নিইনি! আই ওনলি কিলড় হিম।

না, বলল ফেলুদা। আপনি ওঁর আংটি নেননি। সেটা নিয়েছেন আরেকজন।

ঘরে আবার সেই অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। ফেলুদার দৃষ্টি ঘুরে গেল।

বিজয়বাবু–জুয়াতে আপনার অনেক লোকসান হয়েছে। তাই না? আমি কলকাতায় খবর নিয়েছি। আমার লোক আছে খবর দেবার, পুলিশেও আমার বন্ধু আছে। আপনার বিস্তর দেনা হয়ে গেছে।

বিজয়বাবু চুপ।

ফেলুদা বলে চলল, আর আপনার বোধহয় সন্দেহ হয়েছিল যে, বাবা আপনাকে উইলে কিছু দিয়েছেন কিনা। সেই জন্য তাঁকে মেরে তাঁর আংটিটি আপনি হাত করেছিলেন।

মেরে মানে?

মেরে মানে কোনও ভাবী জিনিস দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত মেরে। আপনার বাবাকে আসলে দুজন খুন করে। কার দ্বারা তিনি হত হয়েছিলেন সেটা বোঝা যায় বিছানায় রক্ত দেখে। ছুরির আঘাতই আগে পড়ে, তারপর আপনি মাথায় বাড়ি মেরে হাত থেকে আংটিটা খুলে নিয়ে যান। আপনি খুনি না চোর সেটা অবশ্য আইন বুঝবে, কিন্তু হাতকড়া বোধহয় তিনজনেই হাতেই পড়বে।

মল্লিকদের তাঁবু থেকে নিজেদের তাঁবুতে ফিরে এসে লালমোহনবাবু বললেন, কিন্তু মশাই আপনি একটা ব্যাপারে তো কোনও আলোকপাত করলেন না। আপনাকে দু বার মারার চেষ্টা করল কে?

সে ব্যাপারে আলোকপাত করিনি। কারণ আমি নিজেই ব্যাপারটা সম্বন্ধে শিওর নাই। তিনজন অপরাধীর একজন করেছে তাতে সন্দেহ নেই, এবং সুযোগের দিক দিয়ে বিচার করলে প্রয়াগের কথাই মনে হয়। সপ্রু বা বিজয়বাবু দল থেকে বেরিয়ে এসে এটা করবেন, বিশ্বাস করা কঠিন। যাই হাক, এর জন্য মূল রহস্যোদঘাটনে কোনও এদিক ওদিক হচ্ছে না। ধরে নিন এটা ফেলুমিত্তিরের একটা অক্ষমতার পরিচয়।

যাক, বাঁচা গেল! আপনার ভুল হতে পারে এটা জানতে পারলে একটু ভরসা পাওয়া যায়।

আপনি অযথা বিনয় করছেন। আমি কিন্তু বহু চেষ্টা করলেও আপনার মতো লিখতে পারতাম না।

থ্যাঙ্কস ফর দ্য খোঁচা।